আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা—৬

চিত্রালি

শ্রীসুধীন্দ্র নাথ ঠাকুর

আষাঢ়, ১৩২৩

প্রকাশক

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিউটি প্রেস,

১১ নং ক্রিঘোষের ষ্ট্রীট্,

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত

বিপুল আয়োজনে বিরাট অনুষ্ঠান।

আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা।

য়রোপ প্রভৃতি মহাদেশে "ছয়-পেনি-সংস্করণ"—"সাত-পেনি-সংস্করণ" প্রভৃতি নানাবিধ সুলভ অথচ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয়—কিন্তু সে সকল পূর্ব্বপ্রকাশিত অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীরই অন্যতম সংস্করণ মাত্র। বাঙ্গালাদেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কীর্ত্তিকুশল গ্রন্থকারবর্গ-রচিত সারবান্, সুখপাঠ্য, অথচ অপূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তকগুলি কি, এইরূপ সুলভে দেওয়া যায় না? এখনা দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে—যাহ, যদি কাটতি অধিক হয় এবং মূল্যবান সংস্করণের মতই কাগজ ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। কারণ এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গালাদেশে—পাঠকসংখ্যা বাড়িয়াছে, আর বাঙ্গালা দেশের লোক—ভাল জিনিসের কদর বুঝিতে শিখিয়াছে; এ অবস্থায় 'আট-আনার গ্রন্থমালা' কেন চলিবে না?—সেই বিশ্বাসের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়াই, আমরা এই অভিনব চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আমাদের চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, 'অভাগী'র এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হওয়াই তাহার প্রমাণ।

বাঙ্গালা দেশে—শুধু বাঙ্গালা কেন—সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ উদ্যম এই প্রথম। আমরা অনুরোধ করিতেছি, বাঙ্গালী মাত্রেই আট-আনা সংস্করণ গ্রন্থাবলীর নির্দ্দিষ্ট গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই 'সিরিজে'র স্থায়িত্ব ও আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

কাহাকেও অগ্রিম মূল্য দিতে হইবে না, নাম রেজেষ্টারী করিয়া রাখিলেই আমরা যখন যেখানি প্রকাশিত হইবে, সেইখানি ভি. পি ডাকে প্রেরণ করিব। সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়াই আমরা এই বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি; গ্রাহকের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিলে আমাদিগকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। এই সিরিজের—প্রকাশিত হইয়াছে—

১। **অভাগী**—শ্রীজলধর সেন প্রণীত।

২। **ধর্ম্মপাল**—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ।

৩। **পল্লীসমাজ**—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪। **কাঞ্চনমালা**—মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই।

৫। **বিবাহবিপ্লব**—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি এল।

৬। **চিত্রালি**—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এল্।

৭। **দূর্ব্বাদল**—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত। (যন্ত্রস্থ)

৮। **শাশ্বত ভিখারী**—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম্ এ। (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

চিত্রালি

পোড়ারমুখী

১
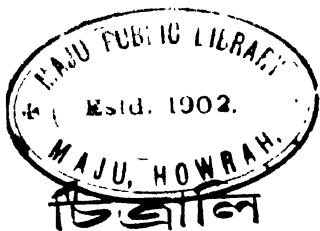
যামিনীনাথের স্ত্রী দামিনীলতার অষ্টম গর্ভের সন্তান স্নেহলতা, ওরফে পোড়ারমুখী।

পোড়ারমুখী বড় অসময়ে আসিয়াছিল। যামিনীনাথ পাঁচটি কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ঋণদায়ে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুইটি পুত্র; তাহাদের শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কোন্ দিক রক্ষা করিবেন যামিনীনাথ ভাবিয়া কূল পাইতেন না।

অষ্টম গর্ভে পুত্র না হইয়া কন্যা হইল। যামিনীনাথ মনের কষ্ট মনে চাপিয়া কন্যার নাম রাখিলেন স্নেহলতা, মা নাম রাখিল, পোড়ারমুখী।

পোড়ারমুখীর যত বয়স বাড়িতে লাগিল তাহার রূপ বয়সকে দ্বিগুণ ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল;—বারো বৎসর

বয়সে পরিপূর্ণ যৌবন-শ্রী বালিকার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া উঠিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার বিবাহের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া বাপমা'র চোখের জল আর শুকাইতে পাইত না।

২

মা তরকারি কুটিতে কুটিতে আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিল। মেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া আঙ্গুলে জলপটি বাঁধিয়া দিল; শেষে দুই হাতে মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মা রাতদিন এত কি ভাবিস্? মা বলিল, যা' তুই খেলা কর্‌গে যা'। মেয়ে ছাড়িল না, বলিল, বল্‌না মা বল্ না। মা হাত উঠাইয়া মেয়েকে চড় মারিতে গেল, হাতখানা কিন্তু গালে না পড়িয়া গলায় জড়াইয়া পড়িল। মা মেয়েকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, পোড়ারমুখী মেয়ে! আর জায়গা পেলিনে, মর্‌তে আমার পেটে এলি—পোড়ারমুখ একেবারে পুড়িয়ে এলি! মেয়ে হাসিতে হাসিতে বলিল, আমার টিয়ে পাখীটা কি বল্‌ছে শোন্ মা। টিয়ে পাখী তখন বলিতেছিল, লক্ষ্মী মা আয়, লক্ষ্মী মা। মায়ের চোখে জল আসিল, বলিল, যা টিয়ে পাখীকে খাবার দিয়ে আয়, আমি রান্না চড়াব।

মেয়ে টিয়ে পাখীর কাছে না গিয়া আস্তে আস্তে বাবার

কাছে গেল। বাবা তখন পঞ্চাশটি টাকা লইয়া হিসাবে ব্যস্ত ছিলেন। নূতন মাস পড়িয়াছে, পাওনাদারেরা একে একে একে আসিয়া জুটিবে ;—বাড়িওয়ালা ভাড়া চাহিবে, গোয়ালা দুধের দাম নিতে আসিবে, মুদী ময়রা স্যাকরা সকলকেই কিছু কিছু দিতে হইবে। কোন্ দিক্ সামলাইবেন যামিনীনাথ ভাবিয়া কূল পাইতেছিলেন না। এমন সময় পোড়ারমুখী ডাকিল ; বাবা! সে ডাক যামিনীনাথের কানে পৌছিল না। আর একটু বড় গলায় মেয়ে আবার ডাকিল, বাবা! যামিনীনাথ এইবার শুনিতে পাইলেন, উত্তর করিলেন, মা লক্ষ্মী! পোড়ারমুখী মনে করিয়াছিল, বাবাকে জিজ্ঞাসা করিবে, মা রাতদিন কেন এত ভাবে, কিন্তু বাবার মুখ দেখিয়া তাহার আর কোন কথা বাহির হইল না। যামিনীনাথ বলিলেন, পয়সা নেবে মা লক্ষ্মী, এই নাও, একটা পয়সা নাও। পোড়ারমুখী পয়সাটি আঁচলে বাঁধিয়া উঠিয়া আসিল এবং রাস্তার ধারে জানালার কাছে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, বাবা, মা কেন এত ভাবে।

৩

গোয়ালার অনেক পাওনা, সে শাসাইয়া গেল, আর দুধ দিবে না ; মুদী বলিয়া গেল, ধারে আর চাল

ভাল দিবে না; স্যাকরা বলিয়া গেল, তিন দিনের ভিতর টাকা না পাইলে সে নালিশ করিবে। যে আসে সেই টাকা চায়,—কেউ আসিয়া ডাকিলে যামিনীনাথের মুখখানা শুকাইয়া যায়।

পোড়ারমুখী সবই বুঝিল। সে সারাক্ষণ বাবার আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়, দরজার পাশে, জানালার নীচে, আনাচে কানাচে যেখানে বসিলে তার বাবাকে দেখিতে পাওয়া যায়, বাবার মুখের দিকে ডাগর ডাগর চোখ দুটি মেলিয়া সেখানে গিয়া সে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে। আজ বাবার মুখখানা বড় শুকনো, বাবার বুকের হাড় ক'খানা গোণা যায়, বাবা দিন দিন বড় রোগা হয়ে যাচ্ছেন,—পোড়ারমুখী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে থাকিত।

সেদিন সন্ধ্যাকালে যামিনীনাথ আফিস হইতে বাড়ী ফিরেন নাই। দুইটা দরোয়ান লাঠি হাতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,—যামিনী-বাবু, যামিনীবাবু বাড়ি আছেন? পোড়ারমুখী দরজার ফাক দিয়া যমদূতের ন্যায় দুই মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল, ভাবিল, বাবাকে এরা মারবে নাকি! সে আস্তে আস্তে তাহাদের কাছে গিয়া বলিল, তোমরা বাবাকে কিছু বোলোনা—তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমাদের অনেক ফুল

দেব। তাহারা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কি বলছ মায়ি? পোড়ারমুখী বলিল, তোমরা বাবাকে কিছু বোলো না, আমি আসছি। সে অপরাহ্নে মালা গাঁথিবার জন্য অনেক ফুল তুলিয়া রাখিয়াছিল—কোঁচোড়ে করিয়া সবগুলি দরোয়ানাদের কাপড়ে ঢালিয়া দিল, কাতরকণ্ঠে বলিল, যাও লক্ষ্মীটি তোমরা যাও। দরোয়ানরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া আর এক সময় আসিবে ঠিক করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। পোড়ারমুখী হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

৪

সন্ধ্যাকালে ছাতের উপর শুইয়া পোড়ারমুখী ভাবিতে লাগিল, আহা, যদি শিউলি ফুলগুলো টাকা হ'ত, ভোর বেলায় কুড়িয়ে এনে মা'র হাতে দিতাম। মা বলত, পোড়ারমুখী সোনামুখী; বাবা বলত, স্নেহলক্ষ্মী বড় লক্ষ্মী। গোয়ালার টাকা সব শোধ হয়ে যেত, স্যাকরা আর বাবাকে শাসাত না, মা রাজরাণীর মত গহনা পরে' বসে থাকিতেন—চাকরাণীরা সেবা করত, বাবা গাড়ি করে' বেড়াতে যেতেন, —ভাবিতে ভাবিতে পোড়ারমুখী ঘুমাইয়া পড়িল।

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া পোড়ারমুখী শুনিল, ওপাড়ার

মোক্ষদা-মাসী মা'র সঙ্গে গল্প করিতেছে ; মাসী বলিল, শোনোনি বোন্, মা কালী জমীদার-বউকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন, আমি তোমাদের নতুন পুকুরে আছি, শীগ্‌গির একটি অষ্টম গর্ভের সন্তান এনে আমার কাছে উচ্ছুগ্‌গো কর্—তবে তোদের পুকুর উথ্‌লে উঠ্‌বে, গোলা ধানে ভরে' যাবে, নাতির নাতির মুখ দেখতে পাবি, নইলে তোর ভিটে-মাটি সব উচ্ছন্ন যাবে। তা' জমিদার বৌ একলক্ষ টাকা দেবে বলেছে—একটি অষ্টম গর্ভের সন্তান কেউ যদি দেয়। পোড়ারমুখী কান্‌খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল। মা বলিল, থাক্ দিদি, ওসব কথায় আর কাজ নেই, ওকথা শুন্‌লেও পাপ হয়। মাসী বলিল, না বোন, তাই কি বল্‌ছি, আমি তোমাকেই কি দিতে বল্‌ছি! মানুষে কি তাই পারে?

প্রতিবেশিনী চলিয়া গেলে মা মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনেকক্ষণ চোখের জল ফেলিল ; তাহার পর মেয়েকে তুলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে নীচে নামিয়া আসিল।

৫

সপ্তাহ কাটিয়া গেল। পোড়ারমুখী একদিন বাবার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, একলক্ষ কত টাকা?

বাবা বলিলেন, অনেক টাকা। পোড়ারমুখী বলিল, গোয়ালার টাকা শোধ যায়? বাবা বলিল, যায়। পোড়ার-মুখী বলিল, স্যাকরার টাকা শোধ যায়? বাবা বলিল যায়। পোড়ারমুখী বলিল সব টাকা শোধ যায়? বাবা হাসিতে হাসিতে বলিল, কেনরে তুই কি একলক্ষ টাকা দিবি? পোড়ারমুখী আর কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

৬

দেওয়ালীর দিন সকালে বাড়িতে প্রদীপ সাজাইতে লাগিল। পোড়ারমুখী বলিল, মা, আমি ঘাটে প্রদীপ দিয়ে আসব। মা বলিল, শীগগির ফিরে আসিস্, কিন্তু নতুন পুকুরে যাস্‌নে যেন।

একখানি ছোট ডুরে সাড়ী পরিয়া, ছোট একখানি থালায় মাটির প্রদীপগুলি সাজাইয়া পোড়ারমুখী ঘাটের দিকে চলিল। সে নতুন পুকুরের দিকেই চলিল। পুকুরে তখনও সিঁড়ি কাটা হয় নাই, মাটির উপর মাটি জমিয়া পুকুরের পাড় পাহাড়ের মত উঁচু হইয়া রহিয়াছে; তাহার চারিধারে পোড়ারমুখী প্রদীপগুলি সাজাইয়া দিল। পাড়ের উপর দাড়াইয়া সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, পুকুরে জল থই

থই করিতেছে—কালো জল, রাত্রে আরও কালো দেখাইতেছে। পোড়ারমুখী একদৃষ্টে অনেকক্ষণ জলের দিকে চাহিয়া রহিল, পরে আঁচলখানি গলায় দিয়া ধীরে ধীরে জলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—যোড়করে 'মা কালী!' বলিয়া চীৎকার করিয়া একেবারে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সেই শব্দে বনের পাখীরা পাখা ঝাড়া দিয়া উঠিল, বন্য পশুর পদক্ষেপে শুক্‌নো পাতা মরমর্ করিয়া উঠিল—তাহার পর সমস্ত নীরব। ক্রমে প্রদীপগুলি একে একে সব নিবিয়া গেল, চারিদিকে কেবল অন্ধকার--কালীর মত কালো অন্ধকার।

রসভঙ্গ

১

বিবাহের একমাস পরে মনোরঞ্জন সস্ত্রীক বরানগরের বাগানবাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

খুব ভোর থাকিতে স্বামী স্ত্রীতে পান্সীতে গিয়া উঠিল। পান্সী তীরবেগে ছুটিয়া চলিল। কল কারখানা জাহাজ জেটি সহরের হট্টগোল ছাড়িয়া পান্সী যখন ফাঁকায় গিয়া পৌঁছিল, মনোরঞ্জন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ছবি-আঁকা গ্রাম, নদীতীর, লতিকামণ্ডপচ্ছায়ে প্রচ্ছন্ন কুটীর, শিবের মন্দির, স্বচ্ছ নীলাকাশ, নদীর কুলু কুলু শব্দ—যেন স্বপ্নরাজ্য বলিয়া বোধ হইল। প্রকৃতি স্নেহময়ী মাতার ন্যায় অনশন-ক্ষুধিত হৃদয়ের মুখে অন্ন দিয়া যেন মনোরঞ্জনের হৃত মানসিক স্বাস্থ্যকে পুনরানয়ন করিলেন। বিবাহের এই এক মাস উৎসব আনন্দে হাস্যরঙ্গকৌতুকতরঙ্গে প্রভা যেন সকলের সঙ্গে মিশিয়াছিল, আজ সে মনোরঞ্জনের অতি নিকটস্থ ও করায়ত্ত বলিয়া মনে হইল। প্রবল উচ্ছ্বাসে মনোরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "সমস্ত জীবনটা যদি এই রকম সুখে ভাসিয়া যাওয়া যাইত।" প্রভা ঈষৎ হাসিয়া কহিল

"অর্থাৎ বল না কেন, পৃথিবীতে যদি ঝড় বৃষ্টি নামক পদার্থটা না থাকিত।"—মনোরঞ্জন কহিল, "তোমার সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি গহন অরণ্য মরণও আমার পক্ষে সুখ!" মনোরঞ্জন উত্তেজিত হইযা দ্বিগুণ উচ্ছ্বাস সহকারে বলিতে লাগিল— "জান প্রভা, এতদিন আমি এই সংসারকে ঠিক মরুর মত দেখিতাম—তপ্ত বালুময় নীরস কঠিন বারিহীন তরুলতাহীন তৃণহীন অসীম প্রান্তর কেবল ধূ ধূ করিতেছে; তাহার মাঝে তৃষ্ণার্ত্ত আমি শুষ্ককণ্ঠে দগ্ধচরণে বাণবিদ্ধ হরিণের মত অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়াইযাছি, কোথাও জল পাই নাই, কোথাও বসিবার ঠাঁই পাই নাই। কত কাঁদিয়াছি, কতবার মরণকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছি, কেহ আমাকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করে নাই। প্রভা, প্রেমময়ি প্রেয়সি, তুমিই আমাকে উদ্ধার করিয়াছ, আমাকে মুক্তি দিয়াছ, হতাশ্বাস মৃত জীবনকে ত্রাণ করিয়াছ। কতবার ভগবানের উপর অবিশ্বাস আসিয়াছিল, পাপ পুণ্য কথার কথা বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কতবার বিপথে কুপথে যাইবার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল, তুমিই আমাকে রক্ষা করিলে! প্রভা, আমি জীবনে কখনো কাহারও নিকট হইতে ভালবাসা পাই নাই, কখনো কাহাকেও ভালবাসি নাই, নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কোন রমণীর সংস্পর্শে

কখনও আসি নাই—তুমিই আমার জীবনের স্পর্শমণি! কতবার এই পথ দিয়া গিয়াছি, কিন্তু আজিকার মত এমন সুখ কখনও পাই নাই!—”

কথা শেষ হইতে না হইতে পাল্কী ঘাটে আসিয়া লাগিল। মনোরঞ্জন আগে নামিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া নামাইয়া দিল। প্রভা নূপুরনিক্কণে মল ঝম্ ঝম্ করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে যখন বাগানে প্রবেশ করিল, প্রস্তরসোপানবাহী পরিষ্কার ছবির মত বাড়িটি, স্ফটিক-স্বচ্ছবারিবর্ষী ফোয়ারা, বহুবিস্তৃত পুষ্করিণী, আম্রতরুকুঞ্জ, সম্মুখে কূলপ্লাবিনী গঙ্গা, সকলেই যেন নীরব অব্যক্ত ভাষায় বাবুর নূতন গৃহিণীটিকে সমাদর করিয়া লইল।

মনোরঞ্জনের আজ বাগানবাড়ী করা সার্থক মনে হইল। দিনগুলা সুখে জলের মত বহিয়া যাইতে লাগিল।

২

প্রভা বাপের বাড়ী হইতে তাহার ছেলেবেলাকার বুড়ী দাসী শঙ্করীকে শ্বশুরবাড়ীতে আনিয়াছিল। তাহার অসুখ হওয়াতে বাগানে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে পারে নাই। দাসীর অভাবে প্রভার বড়ই কষ্টবোধ হইতে লাগিল। মনোরঞ্জন সকলকে দাসী খুঁজিতে বলিয়া দিল।

একদিন সন্ধ্যায় দুইজনে বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে বাগানের মালী আসিয়া খবর দিল, "মা ঠাক্রুণ, একজন দাসী এসে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, আপনি কি তাকে রাখ্বেন?" প্রভা তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিল।

দেখিতে গৌরবর্ণ। বয়স তেইশ চব্বিশ হইবে। পরণে লালপেড়ে শাড়ী। মাথায় ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া জটাবদ্ধ চুল। মুখে বসন্তের দাগ। সামনের দাঁত দুটি ভাঙ্গা। দেখিলেই মনে হয় এক সময়ে দেখিতে সুশ্রী ছিল, অবস্থার ফেরে তাহার এমন দশা হইয়াছে। দাসীশ্রেণী অপেক্ষা তাহাকে অনেক উচ্চ বলিয়া মনে হয়; বেশ বুঝা যায়; দায়ে পড়িয়া তাহাকে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?" সে বলিল, "লক্ষ্মী"। "সব কাজ কর্‌তে পার্‌বে ত?" "কেন পার্‌ব না? যা' বলবেন তাই কর্‌ব।" সেইদিন হইতেই লক্ষ্মী কাজে নিযুক্ত হইল।

নূতন দাসীটি কিছু অতিরিক্ত কৌতূহলপরবশ ছিল। সন্ধ্যায় বারান্দায় বসিয়া মনোরঞ্জন প্রভাতে যখন নানারূপ গল্প হইত, লক্ষ্মী দরজার আড়ালে থাকিয়া একমনে সব

শুনিত। একটু উচ্ছ্বাস হইলে মনোরঞ্জন প্রায়ই বলিত, "প্রভা, আমার জীবনে কখনো কাহাকেও এত ভালবাসি নাই!" লক্ষ্মী শুনিয়া মনে মনে খুব হাসিত। কখনো কখনো দুপুর বেলায় কৌচের উপর পা ছড়াইয়া দিয়া প্রভা শুইয়া শুইয়া বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়িত, আর লক্ষ্মী নীচে বসিয়া পা টিপিয়া দিত। একদিন প্রভা "মৃণালিনী" পড়িতেছে, লক্ষ্মী দেখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "বৌ ঠাক্‌রুণ, মৃণালিনী পড়চ? হেমচন্দ্র বড় নিষ্ঠুর, না?" শুনিয়া প্রভা অবাক্ হইল। "তুই আবার বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়তে শিখ্‌লি কবে?" "হাঁ বৌ ঠাক্‌রুণ, ছেলেবেলায় বাপ মা একটু লিখ্‌তে পড়তে শিখিয়েছিল, তাই বঙ্কিম-বাবুর দু'একটা বই পড়েছি।" প্রভা বলিল, "তুই যে দেখচি আমাদের লিটারারী দাসী হলি।"

দুইমাস বাগানবাড়ীতে কাটিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে মেঘ করিয়া আসিয়াছিল; টিপি টিপি বৃষ্টিও পড়িতেছিল। ওপারের গাছপালা ঘর বাড়ী ধূমাচ্ছন্ন ঝাপ্সা দেখাইতেছিল। বকুলগাছ হইতে টুপ্ টাপ্ করিয়া বারিসিক্ত ফুলগুলি মাটিতে পড়িতেছিল; তাহার গন্ধ ও জলের চঞ্চল ছল ছল শব্দ মনের মধ্যে এক-রকম নেশার ভাব গড়িয়া তুলিতেছিল। প্রভা মুখ ধুইয়া,

চুল বাঁধিয়া, রঙীন কাপড় পড়িয়া, খোঁপায় একটি মালা জড়াইয়া, খাটের উপর চুপ করিয়া শুইয়াছিল, লক্ষ্মী পদ-প্রান্তে বসিয়া পা টিপিয়া দিতেছিল। মনোরঞ্জন সামনের ঘরে ডেস্কের কাছে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিলেন। তখন বর্ষার অন্ধকারে মেঘের গর্জ্জনে, বৃষ্টির শব্দে, তরঙ্গিত গঙ্গার কালোচ্ছ্বাসে প্রভার অন্তরে একটি মুগ্ধ মধুর স্নিগ্ধ সুন্দর আবেশের সঞ্চার হইতেছিল—সে হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া আনন্দজলরেখাপ্লুত চক্ষে লক্ষ্মীর নিকট আপন স্বামীসৌভাগ্যগর্ব্ব উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশ করিতেছিল। সহসা লক্ষ্মীর মুখে একটা উদ্দীপ্ত তীব্রতার ভাব দেখিয়া থামিল, মনে সন্দেহ হইল যে, এই মেঘমেদুর অন্ধকারে অবিরল বৃষ্টিপাতশব্দে লক্ষ্মীরও কোনও সুখ-সৌভাগ্যস্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। নিজের কথা রাখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা লক্ষ্মী, তুই কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলি, তোকে কেহ ভাল-বাসিয়াছিল? লক্ষ্মী স্ফুলিঙ্গবৎ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, ঠিক তোমারি মত ভালবাসিয়াছিলাম, ঠিক তোমার মত ভালবাসা পাইয়াছিলাম। শুনিয়া স্বামীসৌভাগ্য-গর্ব্বিতা প্রভূপত্নী মনে মনে রাগিল—তাহার সহিত কাহারও তুলনা! বিশেষতঃ তাহার দাসী লক্ষ্মীর! কিঞ্চিৎ

উদ্ধতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কি রকম শুনিই না !" লক্ষ্মী অধর দংশন করিয়া কহিল ; "তবে শোন !" হঠাৎ দশদিকের অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া একটা বজ্র ভীষণ অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

লক্ষ্মী একবার ঘরের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইল, যেখানে মনোরঞ্জন বসিয়াছিল, সেইখানে তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর আঁচলের খোটায় চোকের কোণ মুছিয়া বলিতে লাগিল :—

"বৌ ঠাক্রুণ, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ। আমার আসল নাম মৃণালিনী। আমার বাপ মা এক সময়ে খুব সঙ্গতিপন্ন ছিলেন। কলিকাতায় আমাদের বাড়ী। আমার যখন বয়স সাত বৎসর তখন বাপ মা আমার বিবাহ দেন। বিবাহের এক বৎসর পরে আমার স্বামী কলেরা রোগে মারা পড়েন। আট বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া আমি গায়ের গহনা সব খুলিয়া ফেলিলাম, থান পরিতে আরম্ভ করিলাম, একবেলা হবিষ্যি করিতাম, একাদশীর দিন নির্জ্জলা উপবাস দিতাম। বাপ মা অনেক সময় নিষেধ করিতেন, আমি শুনিতাম না। স্বামীর প্রতি আত্যন্তিক ভালবাসা বশতঃ যে ঐরূপ করিতাম তাহা নহে,—আট বৎসরের মেয়ের আর এক বৎসরে কত ভালবাসা হইবে!

লোকের দেখিয়া শুনিয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে এইরূপ করিতাম। এইরূপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আমি শেষে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলাম।

সত্য কথা বলিতে কি, যৌবনে পড়িয়া সময়ে সময়ে মনের ভাবান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় সকলে চুল বাঁধিয়া, রঙীন কাপড় পরিয়া, পায়ে আল্‌তা মাখিয়া, গহনায় ভরিয়া, প্রিয়জনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন, আমার মনে মনে ভারি হিংসা হইত, জীবনটা নিতান্ত বিফল ব্যর্থ মনে হইত। পাছে এই ভাব আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলে, আমি শেষে আর চুল বাঁধিতাম না, কাহারও সঙ্গে মিশিতাম না, ময়লা কাপড় পরিয়া থাকিতাম, সপ্তাহে একদিন মাত্র স্নান করিতাম। যত প্রকার উপায়ে আপনাকে বিশ্রী কুশ্রী দেখাইতে পারে, তাহাই করিতে লাগিলাম।

"এই সময়ে আমাদের অতিদূরসম্পর্কীয় একজন কুটুম্ব আমাদের বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহই যাতায়াত করিতেন। গৌরবর্ণ, দেখিতে খুব লম্বা চওড়া, তখন সবে অল্প অল্প গোঁফের রেখা দিয়াছে মাত্র। তিনি আসিলেই বাড়ীতে তাস খেলিবার খুব ধূম পড়িয়া যাইত। আমার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তিনি আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া খেলাইতে

বসাইতেন, আমি প্রায় রোজই তাঁহার দলে থাকিতাম। খেলিবার সময় কথায় বার্ত্তায় দৃষ্টিতে ইঙ্গিতে আমার প্রতি তিনি এমন ভাব দেখাইতেন, আমি খেলা ভুলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া অনেক সময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। শেষে আমার আর অনিচ্ছা রহিল না, ইচ্ছা করিয়াই আমি রোজ খেলিতে আসিতাম। তিনি না আসিলে আমার কেমন ভাল লাগিত না। ক্রমে সাজসজ্জার দিকেও আমার দৃষ্টি পড়িল। বিকাল হইলে সাবান দিয়া মুখ ধুইতাম, ভাল করিয়া খোঁপা বাঁধিতাম, পরিষ্কার কাপড় পরিতাম; সকল রকমে তাঁহার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

"যখন চৈতন্য হইল, যখন বুঝিতে পারিলাম কোথায় যাইতেছি, তখন দেখিলাম, বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, ফিরিবার শক্তি নাই। নিস্তব্ধ রজনীতে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিয়া অনেকবার সেই মুখ ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতাম, কিন্তু যতই চেষ্টা করিতাম, ততই আরও যেন দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিত। এইরূপে মদনদেব আপনার বিশ্ববিজয়ী প্রভাব আমার উপর বিস্তার করিলেন।

"একদিন দুপুর বেলায় একলা আমার ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় আমার নামে একখানা চিঠি আসিল।

চিঠিটা হাতে লইয়া গা যেন কাঁপিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া খামের উপরের লেখাটা দেখিতে লাগিলাম, তাহার পর কম্পিত হস্তে চিঠিটা খুলিয়া দেখি, যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই,—সেই বাবুটির লেখা। এসেন্স-মাখান রঙীন চিঠির কাগজে মুক্তার মত অক্ষরে লেখা—কত প্রেম কত আক্ষেপ কত মিনতি কত কাতরতা কত সাধ্য সাধনা যদি দেখিতে!—আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। প্রথমে আপনার এই সঙ্গীন অবস্থা ভাবিয়া আমার মনে বিভীষিকার উদয় হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আবার সে ভাব গিয়া এই অযত্ন-বৰ্দ্ধিত রূপরাশি লইয়া একজন পুরুষের হৃদয়কে যে জয় করিতে পারিয়াছি, এই কারণে আপনাকে বড়ই সৌভাগ্য-বতী মনে হইল; মনে মনে ভারি গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। চিঠিটা যে কতবার পড়িলাম, তাহার ঠিক নাই, আশ মিটাইয়া পড়িয়া বাক্‌সে তুলিয়া রাখিলাম। তাহার আর জবাব দিলাম না।

"পরদিন আবার তিনি তাস খেলিতে আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। আমার তাঁহার কাছে যাইতে কেমন লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। তাঁহারও বোধ হয় আমার মত অবস্থা হইয়াছিল, কারণ, সে দিন আর তিনি আমাকে ডাকিতে আমার ঘরে আসিলেন না। মাসীমা আসিয়া

একদিন মধ্যাহ্নে বুড়াবুড়ি নিদ্রিত। দুইটা কাক ঝাঁঝাঁ রৌদ্রে পুড়িয়া চালের উপর খোলা উল্‌টাইতে ব্যস্ত। সতীশ তাহার মায়ের অপেক্ষায় চুপ করিয়া শুইয়া আছে। মা তখন রান্না করিতেছিলেন। আহারান্তে মা যখন আসিলেন, সতীশ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা আমাকে একটা কথা ব'ল্‌বে বল?" মা বলিলেন, "কি বাবা, ব'লব না কেন?"

সতীশ বলিল, "মা, আজ রাস্তা দিয়ে যাচ্চি এমন সময়ে আমাকে দেখাইয়া একটি লোক আর একটি লোককে বলিল, আহা, দেখেচ, এদের কি রকম অবস্থা ছিল, আর এখন কি হয়েছে!—মা, আমাদের কি আগে ভাল অবস্থা ছিল?"

মা তখন শুইয়া পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, "হ্যাঁ বাবা, তোমার ঠাকুরদাদা এক সময়ে খুব বড় লোক ছিলেন, অনেক টাকাকড়ি ছিল। তোমার বাবাই একমাত্র ছেলে ছিলেন। তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তোমার ঠাকুরদাদা পাগলের মত হন।"

সতীশ কহিল, "আচ্ছা মা, বাবাকে কি আমি দেখেচি? কার মত দেখ্‌তে ছিলেন?"

মা বলিলেন, "তখন তুমি খুব ছোট, তোমার মনে

নাই—অনেকটা তোমার ঠাকুরদাদার মত দেখ্‌তে ছিলেন।"

"আচ্ছা মা তার নাম কি ছিল ?"

হিন্দুঘরের স্ত্রীর পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব-পর নহে। সতীশ দেখিল মাযের চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল পড়িল। সে মুখখানি ভার করিয়া বলিল, "আচ্ছা মা ও সব কথা থাক্‌, তার পর কি হ'ল বল।"

আঁচলের খোঁটা দিয়া চোখের কোণ মুছিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "তার পর তোমার ঠাকুরদাদা সমস্ত বিষয়কর্ম্মের ভার ছোট ভায়ের উপর দিয়া দিন রাত কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা কর্‌তে লাগ্‌লেন। একদিন ছোট ভাই তোমার ঠাকুর দাদার কাছে এসে বল্‌লেন, দাদা, টাকা গুলো কেন মিছে ব্যাঙ্কে জমা হ'য়ে আছে, ঐ টাকা নিয়ে আমি একটা কার-বার কর্‌ব ভাবচি, অনেক লাভ হবে। কারবার তোমার নামেও চল্‌বে। ঠাকুরদাদা তাঁকে বল্লেন, তোমার যা' ভাল বিবেচনা হয় কর, আমার দু'বেলা দু'মুটো ভাত জুট্‌লেই হল। তার পর ছোট ভাই কারবার আরম্ভ ক'র্‌লেন। ছয় মাসের মধ্যে কারবার ফেল হ'ল এবং অনেক হাজার টাকা দেনা দাঁড়াল। তোমার ঠাকুরদাদা পথের ভিখারী হ'লেন এবং ক্রমে ক্রমে চক্ষু দুটি গেল।

এখন শুন্‌তে পাই কারবার ফেল হওয়ার কথা সব মিথ্যা, ছোট ভাইই সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেন।"

সতীশ বলিল, "কি অন্যায়!"

এই সময় পাশের ঘর হইতে "উঃ গেলুম" একটা মর্ম্ম-ভেদী আর্ত্তস্বর উত্থিত হইল। মাতাপুত্র ছুটিয়া গিয়া-দেখিলেন, বৃদ্ধা বুকের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে। সতীশ একছুটে দৌড়িয়া গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, আর আশা নাই, বাত হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। সতীশ সমস্ত রাত ধরিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরমার পদতলে বসিয়া সেবা করিল। এমনি স্নেহ বটে। এত যন্ত্রণা, তবুও সতীশের গায়ে একবার পা ঠেকিয়াছিল বলিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় বৃদ্ধা ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া পৌত্রের মুখচুম্বন করতঃ আবার শুইয়া পড়িল। কিন্তু সেই যে শুইল আর উঠিল না।

চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পরিবর্ত্তনের মধ্যে সতীশের উপনয়ন হইয়াছে এবং বৃদ্ধ ক্রমশঃ চলৎশক্তিহীন হওয়াতে বৌবাজার অবধি না গিয়া শিয়ালদার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়িতেছে। সহরের রাস্তায় মুষল-ধারে বৃষ্টি অপেক্ষা স্বল্প বৃষ্টিতে অধিক কাদা হয়। বৃদ্ধ ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় চুণোগলির এক ফিরিঙ্গি "ইউ ড্যাম্ নিগার" সম্ভাষণপূর্ব্বক বৃদ্ধকে সজোরে এক ঠেলা মারিয়া ট্রামের অপেক্ষায় সেই কাষ্ঠখণ্ডের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সতীশ যদি না ধরিত, বৃদ্ধ তখনই রাস্তায় পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। ক্রোধে সতীশের মুখ লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বৃদ্ধকে একটু দূরে রাখিয়া সে ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া প্রাণপণশক্তিতে আমাকে উঠাইয়া ফিরিঙ্গির মাথায় এক ঘা মারিল। মাথা ফাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। লোকে লোকারণ্য এবং পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে সহরের মস্ত এক ধনীলোক প্রকাণ্ড একটা জুড়ি চড়িয়া আসিতেছিলেন।

তিনি দূর হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত দেখিয়াছিলেন। ঘটনা-স্থলের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন এবং পুলিশকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন "উয়ো বাচ্ছাকো কোন্ কসুর নেহি থা, ফিরিঙ্গিনে পহিলে বুঢ়াকো ঢেকিল্ দিয়া থা, উয়ো আউর্ জানিক হোতা তো গির্‌কে মর্ যাতা।" এই বলিয়া তাহার হাতে দশ টাকার একটা নোট্ গুঁজিয়া দিলেন। পুলিশ "উয়ো বাৎ ত ঠিক্ হ্যায়" বলিয়া সতীশকে ছাড়িয়া দুই হাতে সেলাম করিতে করিতে সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করতঃ ফিরিঙ্গিকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া ক্যাম্বেল হাঁস-পাতালের দিকে চলিল। বড় লোকটি সতীশকে কাছে ডাকিয়া তাহার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার হাত হইতে আমাকে গ্রহণপূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে কোঁচবাক্সস্থিত দরওয়ানের লাঠি এবং পঞ্চমুদ্রা তাহাকে দিয়া বলিলেন, "তুমি কিছুদিন আর এ পথে আসিও না।" এই বলিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন। আমি গাড়ীর ভিতর হইতে দেখিলাম, কৌতুহলী দর্শকমণ্ডলীর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সতীশ বৃদ্ধকে লইয়া গৃহাভি-মুখে চলিল।

গৃহে ফিরিয়াই বাবু সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই

লাঠিটা লইয়া এখনই স্যাঁকরার বাড়ী যাও। ইহার মাথাটা সোণা দিয়া বাঁধাইতে হইবে এবং উপরে লেখা থাকিবে "বীরত্বের পুরস্কার।"

দুই দিন পরে এক প্রকাণ্ড পগ্‌গধারী হিন্দুস্থানী দরওয়ান স্বর্ণমণ্ডিত আমাকে হাতে লইয়া বৃদ্ধের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীশ তখন বৃদ্ধকে লইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। সে দরওয়ানকে দেখিয়া পূর্বেকার মারামারির কথা স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইল, কিন্তু দরওয়ান যখন তাহার কাছে আসিয়া বলিল, "রাজা বাবু ইয়ে লাঠি ভেজ্‌ দিয়া হ্যায়," তখন সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিল। দরওয়ানের হাত হইতে আমাকে লইয়া রাজাবাবুপ্রদত্ত সেদিনকার লাঠিটা তাহাকে ফিরাইয়া দিল। বৃদ্ধ আমাকে স্পর্শ করিবামাত্র শিহরিয়া হাত সরাইয়া লইল এবং সতীশকে বলিল, "এত ঠাণ্ডা কেন? লাঠিটা কি ভিজে?" সতীশ তখন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। বৃদ্ধ শুনিয়া কহিল, "এখনি আমাকে সেই বাবুর বাড়ী লইয়া চল।" সতীশ বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া দরওয়ান প্রদর্শিত পথ দিয়া বাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু তখন বারাণ্ডায় বসিয়া আলবোলা টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। দরওয়ান সতীশ ও

বৃদ্ধের আগমনবার্ত্তা তাঁহাকে জানাইল। তিনি তাহাদিগকে উপরে লইয়া আসিতে বলিলেন। তাহারা আসিলে, অতি আদর ও যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে বসাইলেন। বৃদ্ধ আসন গ্রহণ করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসরুদ্ধকণ্ঠে দুই হাত তুলিয়া বলিল, "চিরজীবী হউন! গরীবের প্রতি আপনার এত দয়া, ভগবান আপনার ভাল কর্‌বেন! আমি সতুর কাছে সব শুনেছি। বাবা, আমরা গরীব, পেটে খেতে পাই না, সোণা-বাঁধান লাঠি নিয়ে কি কর্‌বো? আপনি যদি দয়া করে' আমার এই পৌত্রের একটা উপায় করিয়া দেন ত আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি।" বৃদ্ধের আর কথা বাহির হইল না। সতীশ তখন মায়ের নিকট শ্রুত ঠাকুরদাদার জীবন-কাহিনী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। বাবুটী শুনিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ হইতে আপনার পৌত্রের ভার আমি লইলাম।" এই বলিয়া সরকারকে ডাকিয়া সতীশের হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিলেন, "তোমাদের সংসার-খরচের জন্য আমি মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিব, তুমি এখানে আসিয়া লইয়া যাইও,—আর কাল তুমি একবার আসিও, নারিকেল ডাঙ্গায় আমার একখানি ছোট খাট বাড়ী আছে সেইটা তোমার নামে লিখিয়া দিব।" বাক্‌শক্তিরহিত উভয়ে তখন

দুই চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিল। বাবুর গাড়ী তাহাদিগকে বাসায় রাখিয়া আসিল।

বাড়ী আসিয়া সতীশ মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত বলিল। স্নেহময়ী মা পুত্রের মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন, "বুঝি মা দুর্গতিনাশিনী এতদিনে আমাদের দুঃখ ঘুচাইলেন!"

যথাকালে সতীশের নামে বাড়ী লেখাপড়া হইল। গৃহ-প্রবেশের দিন সতীশ বেলেঘাটার আলাপী মুদি ময়রা প্রভৃতি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথাসাধ্য আহার করাইল। আহারান্তে সতীশ আমাকে দেখাইয়া সকলকে কহিল, "এই আমার সোণার লাঠি; যাহা কিছু হইয়াছে ইহারই জন্য।" সতীশের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে বিদায় লইল।

আমার আর আদর যত্নের অবধি ছিল না। নিজের ছেলেকেও কেহ এত ভালবাসে না।

বৃদ্ধ আর বেশী দিন জীবিত রহিল না। সতীশ লেখা-পড়া শিখিয়া কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। জননীর একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সতীশ শেষে বিবাহ করিল। একটি পুত্র হইল। সে মাঝে মাঝে আমাকে হাতে লইয়া চুম খাইয়া বলিত, "বাবার সোণার লাঠি।"

পুরাতন ভৃত্য

"বল্‌চি এখনি দূর হও!"

"আজ্ঞে কি দোষ কর্‌লুম?"

"বেটা নবাবপুত্র হয়েচ, কি দোষ তার আবার তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে! ভাল চাও 'ত এখনি দূর হও, নইলে শেষে ঘাড়ে ধরে' বা'র করে' দেব!"

"আজ্ঞে যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, আপনি মনিব, এইবার আমাকে ক্ষমা করুন, আর কখনো এ রকম কাজ হবে না! আপনার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাচ্চি!"

"কোন কথাই শুন্‌তে চাইনে, এখনি বে'র হও, এই দরোয়ান!—"

তখন পুরাতন ভৃত্য অযোধ্যা আর একটিও কথা না বলিয়া বাবুকে প্রণাম করিয়া একটি ভাঙ্গা সিন্দুক ও ছেঁড়া মাদুরে জড়ান বহুকালের তৈলনিষিক্ত অঙ্গারকৃষ্ণ একটী বালিস মুটের মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া চলিল। অল্প দূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঝি নিস্তারিণীকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "নিস্তার, আমার কাছে মনুকে একবার এনে দিতে পার, যাবার আগে একবার শেষ কোলে করে' নিই!"

নিস্তারিণী বলিল, "আমাদের কি আর ইচ্ছে নেই, তা আমরা কি ক'র্ব্ব বল, বাবু যে তোমার কাছে মেয়েকে দিতে মানা ক'রেচে। দিলে কি আর রক্ষে আছে। তাই ত, এতদিনের পুরোণো লোকটাকে এমন্ ক'ল্লে, আমাদের অদৃষ্টে না জানি কত লাথি ঝাঁটা আছে।" শেষোক্ত কথাগুলি নাসিকা-নির্গত ঈষৎ ভগ্নস্বরে পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে নিস্তারিণী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অযোধ্যা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হতাশমনে চলিয়া গেল।

অযোধ্যা বহুকালের পুরাতন ভৃত্য। হরিহর বাবুর পিতার নিকট সে কাজ করিয়াছে। হরিহর বাবুকে সে স্বহস্তে মানুষ করিয়াছে, এবং এক্ষণে তাঁহার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা মনুকে (মৃণালিনী) মানুষ করিতেছিল। স্বর্গীয় কর্ত্তা ইহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ অনুগ্রহ করিতেন। তাঁহার আমলে অযোধ্যার খুব সুখ ও প্রতিপত্তি ছিল। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত ইহাকে মানিয়া চলিত। কর্ত্তার মৃত্যুর পর হরিহর বাবুও বরাবর অযোধ্যাকে একটু সমীহ করিয়া চলিতেন। কিন্তু দুই বৎসর হইল দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণের পর হইতে হরিহর বাবুর কেমন ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। নূতন গৃহিণী পুরাতন ভৃত্যের মর্য্যাদা কি বুঝিবেন! অযোধ্যার কর্ত্তৃত্ব তাঁহার একেবারে অসহ্য

বিষতুল্য বোধ হইত। তিনি চাহিতেন, প্রাচীন ভৃত্য তাঁহার নিকট নিতান্ত নরম খাটো হইয়া চলে, কিন্তু অযোধ্যা সব সময়ে তাহা পারিয়া উঠিত না। এই জন্য প্রভুপত্নী ও ভৃত্যে প্রায়ই খিটিমিটি বাধিত। আজ অযোধ্যা আর থাকিতে না পারিয়া মুখের উপর দুই এক কথা শুনাইয়া দিয়াছিল। প্রভুপত্নী কাঁদিয়া আকুল, ধূয়া ধরিলেন,—অযোধ্যাকে না তাড়াইয়া দিলে তিনি জলস্পর্শও করিবেন না। এই জন্য হরিহর কর্তৃক অযোধ্যার এইরূপ লাঞ্ছনা।

এইরূপ তিরস্কৃত অপমানিত হইয়াও অযোধ্যা থাকিবার জন্য একান্ত অনুনয় বিনয় করিয়াছিল, বারবার ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়াছিল, তাহার যে অন্ন মারা গেল কিম্বা তাহার যে অন্য গতি নাই—সে জন্য নয়। সে জানিত, চেষ্টা করিলে অন্যস্থানে ইহা অপেক্ষা বেশী মাহিনায় চাকরী পাইতে পারে। কিন্তু স্বার্থের প্রতি তাহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া যে পরিবারের জন্ম মৃত্যু উৎসব রোগ শোক বিপৎপাতে নিতান্ত আপনার জনের মত হাসি অশ্রু শরীরের রক্ত সম্মিলিত করিয়া আসিয়াছে, যে গৃহের প্রত্যেক ছোট বড় সকলের শৈশবদৌরাত্ম্যের লাঞ্ছনা আজ পর্য্যন্তও দেহে ধারণ করিয়া আছে, যাহার কড়ি বরগা ইট

পর্য্যন্তও তাহার নিকট নিতান্ত পরিচিত আত্মীয়বৎ,—প্রভু যদি মোহবশতঃ অপমানও করিয়া থাকেন, কেমন করিয়া সে, সে পরিবার, সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায়! বিশেষতঃ মনু তাহার প্রাণ। সে জানিত, তাহাকে ছাড়িয়া সে একদণ্ডও থাকিতে পারিবে না। কিন্তু মনিব যখন কিছুতেই শুনিলেন না, তখন সে আর কি করে! তাহার মনে যাহা হইতেছিল, তাহা সেই জানে!

বহিস্কৃত হইয়া অযোধ্যা মনিববাড়ীর দুই চারিখানা বাড়ীর পরে এক মণিহারীর দোকানে গিয়া উঠিল। মাসে মাসে দোকানদারকে কিছু দিবে বলিয়া তাহার সেইখানে থাকিবার ও খাইবার বন্দোবস্ত করিল। আসল অভিপ্রায় এই যে, এইখানে থাকিলে ঝির সঙ্গে মনু যখন রাস্তার এ দিকে বেড়াইতে আসিবে, তাহার সহিত দেখা হইবে।

অপরাহ্নে ঝির সঙ্গে বেড়াইতে আসিয়া মনু প্রায় প্রত্যহই অযোধ্যাকে দেখিতে পাইত। বাড়ীর কেউ কোথাও আছে কি না, একবার এদিক ওদিক দেখিয়া একেবারে সবেগে অযোধ্যার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িত ও তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া কত যে প্রশ্ন করিত তাহার ঠিক্ নাই। "বাবা তোমাকে দুষ্টু বলে," "বাবা তোমার কাছে

যেতে বারণ করে," "তুমি বাবাকে বল না আর কর্‌বে না," "তুমি কোথা থাক কি খাও ?" ইত্যাদি। কখনও কখনও বাড়ী হইতে দুই একটা পয়সা আনিয়া অযোধ্যাকে দিয়া বলিত, "তুমি পয়সা নিয়ে মুড়ি কিনে' খেও।"—তখন অসুরতুল্য ভীমদেহ অযোধ্যার নিরোধ করিবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ দিয়া জল পড়িত।

একদিন মনু বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছে এমন সময় অযোধ্যাকে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিল, বলিল, "তুমি লুকিয়ে আমাদের বাড়ী একবার এস না!" ঠিক্ এই সময় মনুর পিতা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনু পিতাকে দেখিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া কি করিবে ঠিক্ করিতে না পারিয়া আযোধ্যাকে বলিল, "তুমি দুষ্টু! তুমি চলে যাও!" মনু যে কি জন্য কি ভাবে কথা গুলি বলিল, ভৃত্যের তাহা আর বুঝিতে বাকী রহিল না। মনুও মনে মনে বেশ বুঝিল, "অযুদা" তাহার কথা কখনও অন্যভাবে গ্রহণ করিবে না।

একদিন বাবু যখন গাড়ীতে উঠিবেন, অযোধ্যা পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া শেষ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিল, যদি তাহাকে রাখেন। বাবু যখন কোন মতেই সম্মত হইলেন না, তখন অযোধ্যা মনে মনে ভাবিল, মনুকে দেখা দিয়া

কেনই বা তাহাকে কষ্ট দিই এবং আমিও কষ্ট পাই। অতঃপর মণিহারীর দোকান হইতে বাসা উঠাইয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল, কেহ বলিতে পারিল না।

অযোধ্যা চলিয়া যাইবার পর হইতে মন্নু দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। তাহার খেলাধূলায় স্পৃহা নাই, আহারে রুচি নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই; সারাদিন সে মুখ ভার করিয়া থাকে। অপরাহ্নে বেড়াইতে গিয়া ঝিকে ঠেলিয়া মণিহারীর দোকানে লইয়া যায়, সেখানে গিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অযুদা' কোথায়?" দোকানদার প্রত্যহই বলে, "মা, সে ত এখানে নাই।" তখন মন্নুর মুখখানি কষ্টে শুকাইয়া এতটুকু হইয়া যাইত।

অযোধ্যার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে মন্নুর ভারি শক্ত ব্যায়রাম হইল। প্রায় বৎসরাবধি ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করিল বটে, কিন্তু অযোধ্যাকে সে একেবারে ভুলিতে পারিল না।

মন্নু যখন ব্যায়রামে ভুগিতেছিল, অনেক স্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছিল। হরিহর বাবু জমীদার, তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ দিবার জন্য সকলেই লালায়িত। মন্নুর ব্যায়রামের জন্য হরিহর বাবু এতদিন কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই! এক্ষণে একটি ভাল

পাত্র মনোনীত করিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া ঘরজামাই রাখিবেন, সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌ করিলেন।

মনু হরিহর বাবুর একমাত্র কন্যা ও বড় আদরের। অল্পদিনের মধ্যে খুব ধূমধামের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হইল। বহুদিন ধরিয়া থিয়েটার নাচ প্রভৃতি কত যে আমোদ প্রমোদ হইল, তাহার ঠিকানা নাই। হায়, মনুর মা (হরিহর বাবুর প্রথমপক্ষের স্ত্রী) যদি এই সময়ে বাঁচিয়া থাকিতেন! মনুর মাকে স্মরণ করিয়া হরিহর বাবু বিবাহের পূর্ব্বদিন সমস্ত রাত ধরিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিবাহের পর যে ঘটনা ঘটিল, তাহাতে হরিহর বাবুকে বজ্রদীর্ণ কদলীবৃক্ষের ন্যায় একেবারে ভূমিশায়িত করিল। বিবাহের একমাস পরেই জামাইটি কলেরা রোগে আক্রান্ত হইল। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার দেখান হইল কিছুতেই বাঁচিল না। হরিহর বাবু আর বিছানা হইতে উঠিতে পারিলেন না। কন্যার দশা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ যেন ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কন্যার মুখের দিকে চাহেন, আর দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যায়। সমস্ত আমোদ আহ্লাদ এমন কি মৎস্যাহার পর্য্যন্ত ত্যাগ করিলেন। কন্যা আপনার দারুণ অবস্থা

বুঝিতে না পারুক, অন্যকে কাঁদিতে দেখিলে সেও উচ্চৈঃ-স্বরে কাঁদিত।

হরিহর বাবু মনে মনে ভাবিলেন, হয় ত নিরপরাধ প্রভুভক্ত অযোধ্যাকে তাড়াইয়া দিয়াই তাঁহার এই সর্ব্বনাশ ঘটিল। এই ভাবনা কুশাঙ্কুরের ন্যায় দিবারাত্র তাঁহার মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে লাগিল। অযোধ্যাকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন, কেহ কিছু ঠিকানা করিতে পারিল না। অযোধ্যার দেশে চিঠি লিখিলেন। সেখান হইতে উত্তর আসিল, আজ দুই তিন বৎসর যাবৎ অযোধ্যা দেশে যায় নাই।

হরিহর বাবু দিন দিন কঙ্কালপ্রায় শীর্ণ হইতে লাগিলেন। ডাক্তারেরা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে বিশেষরূপে পরামর্শ দিল। হরিহর বাবুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মীয় স্বজন জোর করিয়া তাঁহাকে বিলাসপুরে পাঠাইয়া দিল। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও মনু গেল।

কলিকাতার জমীদার বাবু আসিয়াছেন, গ্রামে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। দরিদ্র ভিখারী দোকানদার সকলেই ভাবিল, এই বার দু'পয়সা লাভ করিব। হরিহর বাবুও মুক্তহস্তে সকলকে দান করিতে লাগিলেন।

দুই মাস গত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস, রাত্রি প্রায়

এগারোটা। হরিহর বাবু বিছানায় বসিয়া পার্শ্বস্থিতা নিদ্রিতা কন্যাকে বাতাস করিতেছেন। তখন স্বামী স্ত্রী কেহই আহার করেন নাই। এমন সময় বাহিরে ভীষণ রৈ রৈ শব্দ শুনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুতর মশালের আলো দেখা দিল। হরিহর সভয়ে কন্যাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দস্যুদল সবলে দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। তৎপরে আগুন ধরাইয়া বাক্স ভাঙ্গিয়া যে যাহা পাইল দুই হস্তে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। সকলে যখন এইরূপ কার্য্যে ব্যস্ত, মনু হঠাৎ 'অযুদা' 'অযুদা' বলিয়া চীৎকার করিয়া দলপতির কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে তাহাকে কোলে করিয়া খানিকক্ষণ নিঃস্পন্দ নির্ব্বাক্ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর দলের সকলকে ডাকিয়া বলিল, "যা' হইবার হইয়াছে, এক্ষণে সমস্ত জিনিষপত্র রাখিয়া তোমরা এখান হইতে চলিয়া যাও, যে আমার কথা অমান্য করিবে, এই খড়্গ দ্বারা তাহার মুণ্ডপাত করিব!" দস্যুরা ব্যাপারখানা কি বুঝিতে না পারিয়া সর্দ্দারের আদেশে বিষণ্নমনে চলিয়া গেল। তখন অযোধ্যা প্রভু ও প্রভুপত্নীর বন্ধনমোচন করিয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "এখন আমাকে পুলিশের

হাতে দিন আর যাই করুন, আমি আর আপনাদের ছাড়িতেছি না!” হরিহর বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “অযোধ্যা, তুমি আমাকে মানুষ করিয়াছ, তুমি আমার পিতৃতুল্য, আমার অপরাধ ক্ষমা কর,—তোমাকে যে কত খুঁজিয়াছি, তাহার ঠিক নাই!”

সকলে প্রকৃতিস্থ হইলে অযোধ্যা বলিতে লাগিল,—“মনুকে ছাড়িয়া যাইবার পর আমি যেন ঠিক পাগলের মত হইয়াছিলাম। কতদিন যে অনাহার অনিদ্রায় কাটাইয়াছি তাহার ঠিক নাই। ছোট মেয়ে দেখিলেই মনুর কথা মনে পড়িয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইত। ক্রমে ভগবানের প্রতি অবিশ্বাস আসিল, মানুষের উপর ঘৃণা জন্মিল, দয়া মায়া স্নেহ সমাজের কৌশল এবং পাপ পুণ্য কথার কথা বোধ হইল। অত্যাচার নিষ্ঠুরতাই আমার মূলমন্ত্র হইল। শেষে এক ডাকাতের দলে মিশিলাম। আমার আকৃতি দেখিয়া তাহারা আমাকে দলপতি করিল। এই বিলাসপুর হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে আমাদের আড্ডা। হায়, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছি, তাহার ঠিক নাই। শুনিলাম কলিকাতা হইতে এক জমীদার বাবু বিলাসপুরে আসিয়াছেন, সেই জন্য, আজ রাত্রে এইখানে ডাকাতি করিতে আসিয়াছিলাম। কে জানিত, এখানেই আপনাদের দেখিতে পাইব!”

রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া হরিহর বাবু ভৃত্যকে আহারের যোগাড় করিতে আদেশ দিলেন, এবং বলিলেন, অযোধ্যাও তাঁহাদের সহিত আহার করিবে।

সকলে আহারে উপবেশন করিলে হরিহর বাবু নিজ হাতে করিয়া অপর্য্যাপ্ত মাছ মাংস অযোধ্যার পাতে দিলেন। অযোধ্যা বলিল, "এস মনু, দিদি এস, আগেকার মত এক-সঙ্গে খাই।" হরিহর বাবু ছলছলনেত্রে বলিলেন, "মনু যে বিধবা, ও খাইবে না।" হাতের ভাত আর মুখে উঠিল না, অযোধ্যা সেইখানে শুইয়া পড়িল।

পাগল

আমি ছেলেবেলা হইতে পাগল ভালবাসি। সংসারী হিসেবী লোক আমার দুই চক্ষের বিষ।

সহরের ছাঁটছোঁটা কৃত্রিমতা ছাড়িয়া প্রাকৃতিক জগতের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে আসিয়া মনে যেমন একটা আরাম বোধ হয়, তেম্‌নি, অতিশয় মাথাঠাণ্ডা বিজ্ঞ লোকদের কাছে থাকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একজন পাগলের সঙ্গলাভে আমার মনে ভারি স্ফূর্ত্তি হয়।

আমি অনেক সময়ে পাগল নাচাইয়া থাকি;— দেখি, তা'রা কি ভাবে কথা কয়, কি ভাবে ওঠে বসে হাসে কাঁদে সৃষ্টিছাড়া কাজ করে। আমার কাছে অনেক পাগল আসিয়াও জুটে।

সেদিন নীচে বারান্দায় বসিয়াছিলাম, এমন সময় দেখি, একটা লোক সম্মুখের বাগানে প্রবেশ করিয়া হাতে ফুঁ দিয়া "ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা!" তিনবার বলিয়া ফুল পাড়িতে আরম্ভ করিল। আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না,—আমি তখনি চাকরকে দিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। সে আসিলে, চাকরের যেমন দুর্ব্বুদ্ধি, তাহার চেহারা বেশভূষা দেখিয়া তাহাকে বসিবার জন্য একটা টুল্ আনিয়া দিল। সে তাহাতে বসিবে কেন!

—ফস্ করিয়া একটা মখ্‌মলের ইজিচেয়ারের উপর ধূলা-মাথা পা ছ'খানি ছড়াইয়া দিয়া বেশ আরাম করিয়া বসিল। খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া কহিল, "ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা—আমাকে ডাকিয়াছ কেন?"

আমি কহিলাম, "ফুঁ দিয়া ওটা কি হইল?"

সে কহিল, "তবে আমি চলিলাম!"

আমি তাহার কাছ হইতে কথা বাহির করিবার জন্য বলিলাম "আমি ত সব জানি, আমি যে, সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

সে কহিল, "হাঁ্যা, তাই ত! তুমি ত সেখানে ছিলে। কাহাকেও ত বল নাই?"

আমি কহিলাম, "রামো! তাহাও কি হইতে পারে! তবে ঘটনার মাঝে মাঝে অনেক ভুলিয়া গিয়াছি। তাহার পর কি হইল বল দেখি।"

সে কহিল, "তবে সবটা বলিব? শুনিবে? কেহ নাই ত! আচ্ছা, নভেলের মত করিয়া বলি। ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা!"—চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া পাগল বলিতে লাগিল:—

"বাবারও যেমন বুদ্ধি, এমন্ সোণারচাঁদ ছেলে থাকিতে কি না কোথা হইতে আর একটাকে কুড়াইয়া

আনিল। সেটাকে আনিয়া দুধ ঘি খাওয়াইয়া খুব মোটা করিতে লাগিল, এ দিকে আমি না খাইয়া খাইয়া খড়ের মত শুকাইয়া যাইতে লাগিলাম। বেটা নবাবপুত্রের মত পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকিত, আর আমি যত ফাইফর্‌মাস্ খাটিয়া মরিতাম। একটা পয়সার জন্য আবার তাহার সুপারিস্ করিতে হইত। বেশ হইয়াছে! কেমন জব্দ!—ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা!

"বাবা সেটাকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিল। সে এণ্ট্রেন্স পাশ করিলে খুব ঘটা করিয়া তাহার বিবাহ দিল। আমি যেমন মূর্খ ছিলাম তেম্‌নি রহিলাম। আমার বয়স বাড়িতে লাগিল তবু বিবাহ হইল না। আমার কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বাবা বলিত, "ওটার কিছু হইবে না!"—তেম্‌নি জব্দ! কেমন হইয়াছে! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা!

"কিন্তু আহা! বৌটি ভারি লক্ষ্মী ছিল। তাহার মনটা ঠিক ঐ বেলফুলের মত পরিষ্কার সাদা ছিল। আমাকে কি ভালবাসিত!—সে নিজে না খাইয়া আমাকে খাওয়াইত, গোপনে টাকাকড়ি পয়সা কত কি ভাল ভাল জিনিস আমাকে হাতে করিয়া দিত। সেটা জানিতে পারিয়া কত গালাগালি দিয়াছে, প্রহার করিয়াছে,—

তবুও তাহার যত্নের বিরাম ছিল না। এক এক দিন সেটা বাহির হইয়া গেলে বৌ আমাকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া মিষ্ট কথায় কত সান্ত্বনা দিত. বলিত, "তুমি কি করিবে, ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, ঈশ্বর তোমার কষ্ট দূর করিবেন।"—বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিত। বলিব কি, তাহাকে আমার ফুল চন্দন দিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা করিত। বানরের গলায়ও এমন মুক্তাহার পড়ে! থুঃ! থুঃ! থুঃ! ঠিক বলিতেছি কি না?

"আমি স্যাঁৎসেতে একটা নীচের ঘরে পড়িয়া থাকিতাম। দরজা জানালা সব ভাঙ্গা, ছাতের চারিদিক ফাটা। বর্ষায় চারিদিক হইতে জল আসিয়া ঘর ভাসিয়া যাইত। দেয়াল শৈবালাচ্ছন্ন. ঘরের কোণে দুই একটা গাছও গজাইয়া উঠিয়াছিল। আমি তক্তার উপর বসিয়া নিজেকে দ্বীপাশ্রিত রবিন্সন্ ক্রূসোর ন্যায় মনে করিতাম। ভাগ্যিস্ আমার কল্পনাটা অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল, নহিলে, সেই ঘরে এক দণ্ডও টিকিতে পারিতাম না।—আমি বসিয়া বসিয়া দেখিতাম—পুকুরের পাড়ে সারি সারি নারিকেল গাছ দানবের মত দাঁড়াইয়া আছে; বকুল গাছে সাদা সাদা বকেরা বাসা করিয়াছে,—যাইতেছে আসিতেছে; জামরুল গাছ হইতে টুপ্ টাপ্ করিয়া অবিরত ফল মাটিতে পড়ি-

তেছে পাখীরা আসিয়া ঠোক্‌রাইতেছে; আকাশে চিল উড়িতে উড়িতে হঠাৎ ছোঁ মারিয়া পুকুরের মাছ লইয়া পলাইতেছে।—তখন আমার ইচ্ছা করিত ঐ চিলের মত একটা লোককে ধরিয়া চিরিয়া ছিঁড়িয়া তাহার বুকের রক্ত পান করি! কাহার কথা বলিতেছি বুঝিতে পারিয়াছ? সেই জানোয়ারটা! সেই লাঙ্গূলহীন বাঁদরটা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা!

"আমার বসিয়া বসিয়া ভারি বিরক্ত ধরিতে লাগিল —কাজ করিবার ইচ্ছা হইল। বৌকে সে কথা জানাইলাম। বৌ শুনিয়া খুব খুসী হইল। কিন্তু কাজ পাই কোথায়!

"একদিন পাঁজি দেখিয়া সকাল সকাল আহার করিয়া কাজের চেষ্টায় বাহির হইলাম। সমস্ত দিন রোদে রোদে ঘুরিয়া সন্ধ্যার দিকে এক দোকানে আসিয়া বসিলাম। দোকানটি নূতন খোলা হইয়াছে, তখনো জিনিসপত্তর ভাল করিয়া গুছান হয় নাই। দোকানদারকে আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। সে আমাকে রাখিতে সম্মত হইল। আমার দশ টাকা বেতন স্থির হইল, দশটা হইতে বেলা পাঁচটা অবধি জিনিসপত্তর বিক্রয় করিতে হইবে।

"আমি রোজ দোকানে যাইতে লাগিলাম। প্রথম যে দিন বেতন পাইলাম, বৌয়ের জন্য একটা ভাল ঢাকাই সাড়ি কিনিয়া আনিলাম। বৌকে দিতে সে বলিল, "আমার জন্য কেন মিছামিছি পয়সা খরচ করিয়া কিনিতে গেলে!" কিন্তু দেখিলাম, খুব যত্ন করিয়া কাপড়খানা আল্‌মারীতে তুলিয়া রাখিল। আমার ভারি আনন্দ হইল। উঃ! সে সব মনে পড়িলে! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা!

"একদিন বিকালে দোকান হইতে আসিয়া দেখি বাড়িতে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সেই বাঁদরটার একটা আংটি হারাইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া বৌকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিতেছে, বলিতেছে, "তুমি যেখান হইতে পার আমার আংটি আনিয়া দাও!" বৌ বলিতেছে, "আমি কি আংটি চুরি করিয়াছি!" "হাঁ, তুমি চুরি করিয়াছ!" "তবে আমাকে জেলে দাও!" পাজি ছুঁচোটা কিছু না বলিয়া আল্‌মারী হইতে চাবির গোছাটা টানিয়া লইয়া বৌকে ছুঁড়িয়া মারিল। বৌ মাটিতে শুইয়া পড়িল —তাহার কপাল কাটিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। উহুহুহু! আহাহাহা!—আমি দৌড়িয়া গিয়া শূয়ারকে এক লাথি মারিলাম। বাবা সেটাকে কিছু না

বলিয়া আমার কাণ ধরিয়া চড় মারিতে মারিতে নীচে পাঠাইয়া দিলেন। এমন বিচার কখন দেখিয়াছ!”—এই বলিয়া পাগল উঠিয়া মাটিতে তিনবার পদাঘাত করিল।

“আমি কিছু খাইলাম না। সমস্ত রাত্রি বসিয়া বসিয়া রাগের জ্বালায় নিজের চুল নিজে ছিঁড়িতে লাগিলাম। রাত্রি শেষ হইতে না হইতে উঠিয়া সেটার বসিবার ঘরে গিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেয়ালে টাঙ্গান খাপ্ হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া কটিতে লুকাইয়া রাখিলাম।

“দোকানে যাইলাম না। সমস্ত দিন পুকুরের পাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সঙ্কল্প আঁটিতে লাগিলাম। বৌ অনেক চেষ্টা করিয়াও আমাকে কিছু খাওয়াইতে পারিল না।

“ক্রমে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হইতে রাত্রি হইয়া আসিল। আমি পুকুরের পাড়ে ঘাটে বসিয়া শুনিলাম, এগারোটা বারোটা একটা বাজিয়া গেল। আমার আর কিছুই মনে ছিল না;—আমি তখন বসিয়া বসিয়া সেই অন্ধকার আকাশপটে মানস-তুলিকা দিয়া একটি ভীষণ চিত্র আঁকিতে-ছিলাম;—আমার শিকার নিদ্রিত, আমি অস্ত্র লইয়া তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান;—কি করিয়া ছোরা ধরিব! কেমন করিয়া মারিব! পেচক চীৎকার করিয়া বলিয়া

গেল—"এই বেলা!" ঝোপ্ হইতে একটা জন্তু বাহির হইয়া ডাক দিয়া জানাইল—"ভীরু! এই অবসর!"—আমি উঠিয়া অন্ধকারে একেবারে শয়নগৃহে খাটের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখি, মশারির ফাঁক হইতে রূপার বোতাম লাগান জামার একটা হাত একটু বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আমি ঠিক করিলাম, খাটের এই প্রান্তে নিশ্চয় সেটা শুইয়া আছে। তৎক্ষণাৎ মশারি তুলিয়া ছোরা বসাইয়া দিলাম। কিন্তু একি! এ কাহার আর্ত্তস্বর! এ যে বৌয়ের কণ্ঠস্বরের মত বোধ হইল!—ছোরাটা ঘরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দৌড়িয়া নীচে আসিয়া পুকুরে হাত ধুইয়া তক্তার উপর শুইয়া পড়িলাম। সংশয়ে ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল—আমি আর আমাতে ছিলাম না। ওহোহো! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা!

"বাড়িতে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। লোকে পুলিশে চারিদিক ভরিয়া গেল। আমি যখন জানিতে পারিলাম কি করিয়াছি, কাহাকে মারিতে কাহাকে মারিয়াছি, তখনকার মনের অবস্থা—উঃ! বলা যায় না!

"সকলেই কিন্তু বাবার সেই পুষ্যিটাকে সন্দেহ করিল। বৌয়ের সহিত সেটার প্রায়ই ঝগড়া হইত, পূর্ব্বদিনে সে

চাবি ছুঁড়িয়া মারিয়াছে, তাহারই রক্তমাখা ছোরা ঘরে পাওয়া গিয়াছে,—সন্দেহ হইবার এই সকল কারণ।

"যথাকালে মকদ্দমা হইল। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া সেটার ফাঁসির হুকুম হইল।

"সেটা ত আমার হাত এড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি যে এখন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি! হায়, হায়, বানরকে মারিতে গিয়া তাহার গলার মুক্তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি! বৌয়ের সেই মরণ-ক্রন্দন এখনো আমার কাণে বাজিয়া তপ্ত লৌহশলাকার ন্যায় দিবারাত্র আমাকে দগ্ধ করিতেছে! দেখ না, যে হাতের মুটিতে অস্ত্র ধরিয়াছিলাম সেই হাতের অঙ্গুলি সব বাঁকিয়া গিয়াছে! প্রত্যহ উষাকালের নবফুটন্ত পবিত্র পুষ্প দিয়া হাতের এই পাপ মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছি না। উঃ কি যাতনা!—ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা! ফুঃ উড়ে যা!—পাগল তাহার হাতটা আমাকে একবার দেখাইয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। আমি তখন "ফুঃ উড়ে যা"র অর্থ বুঝিলাম। ভাবিতে লাগিলাম লোকটা কি সত্য সত্যই পাগল! যাহা হৌক আমার সমস্ত দিন ভাবিবার খোরাক হইয়া রহিল।

অগ্নি পরীক্ষা

আমি বৃদ্ধ, পেন্‌সন্‌ লইয়া বাড়িতে বসিয়া আছি।

সেদিন সকালবেলা বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া গাছের তদারক্‌ করিতেছি, এমন সময়ে প্রাচীরের কাছে সেই পুরোণো বাব্‌লাগাছে দৃষ্টি পড়ায় দেখিলাম, তাহার গায়ে কোন শাণিত অস্ত্রে বড় বড় অক্ষরে খোদিত আছে—"১৩ই আষাঢ়, সোমবার, ১৮৭৯।" লেখাটা আমার খুবই পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু কে লিখিয়াছে এবং কেন যে লেখা হয়, কিছুতেই মনে আনিতে পারিতেছিলাম না। অন্ধকার গৃহে পাখী যেমন একবার এ দেয়ালে একবার ও দেয়ালে উপর্য্যুপরি আঘাত খাইয়া উড়িতে উড়িতে হঠাৎ এক্‌টা ছিদ্র দিয়া বাহিরের আলোকে আসিয়া বাঁচে,—আমিও তেম্‌নি অতীতের অন্ধকার গহ্বরে হাতড়াইতে হাতড়াইতে যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, তখন, হঠাৎ এই লেখা সম্বন্ধীয় ঘটনাটি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া আমার মনকে সুস্থির করিল।

তখন ঢাকার এই বাড়িতেই থাকিতাম। অবশ্য বাড়ির এই রকম শ্রী ছিল না। দুই তিনটি ভাঙ্গা ঘর মাত্র ছিল। পুকুরের চারিপাশ চাল্‌তা গাছে ভরিয়া গিয়াছিল,

এবং এই বাগানকে তখন বাগান না বলিয়া জঙ্গল বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। আমি পেন্‌সন্ লইয়া এখানে আসিয়া বাড়িটা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া তুলিয়াছি, জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া ভাল ভাল নূতন গাছ সব লাগাইয়াছি—আর সে পুরাতনের কিছুই নাই। যাক্ সে কথা। আমার বৃদ্ধ পিতা শিষ্য-বাড়ি ঘুরিয়া দক্ষিণা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই সংসার চলিত। কিন্তু তিনি আর বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর আমিই গুরুপদে অভিষিক্ত হইলাম। এক বৎসর যাবৎ এই গুরুগিরি করিয়াছিলাম। আমার পিতার সমবয়সী বৃদ্ধদের মস্তকের উপর পা তুলিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হইত—এম্‌নি ঘৃণা লজ্জা বোধ হইত যে কি বলিব! এদিকে তখন এণ্ট্রেন্স্ পাশ করিয়া এফ-এ পড়িতেছি,—পড়াশুনা করিব, না শিষ্য-বাড়ি ঘুরিয়া বেড়াইব! অথচ, দক্ষিণা না জুটিলে আহার এবং পড়াশুনা উভয়ই বন্ধ হয়। কিছু ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে আমার পিতার অকৃত্রিম সুহৃদ অম্বিকা বাবুকে গিয়া ধরিলাম। তিনি ঢাকাতেই পাঁচশত টাকা মাহিনায় গভর্ণমেণ্টের বড় একটা কাজ করিতেন। তিনি আমাকে তাঁহার কাছে রাখিয়া আমার পড়াশুনার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি মা ও বোনকে মামাবাড়ি

পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার বাড়িতে উঠিয়া গেলাম। পূর্ব্ব হইতেই অম্বিকাবাবুর বাড়িতে আমার খুবই যাতায়াত ছিল। অম্বিকাবাবুর স্ত্রী আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আমি তাঁহাদের ঘরের ছেলের মত হইয়া রহিলাম।

অম্বিকাবাবু কলিকাতাবাসী ব্রাহ্ম, শুধু কার্য্যোপলক্ষে এইখানে আছেন। তাঁহার ছোট ছোট ছেলেরা আমার বাঙ্গালে কথা শুনিয়া প্রথম প্রথম খুব ঠাট্টা করিত, আমাকে রাগাইবার চেষ্টা করিয়া কত কি বলিত—"বাঙ্গাল পুঁটি-মাছের কাঙ্গাল!" "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু!" —ইত্যাদি। কিন্তু অম্বিকাবাবুর পঞ্চদশবর্ষীয়া কন্যা নির্ম্মলা বরাবর আমার পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাদের সহিত ঝগড়া করিত; বলিত, "কথায় কি আসে যায়, বাঙ্গালদের মত কাজের লোক হ দেখি!"—কখনো চড় চাপড়টাও তাহাদের পিঠে বসাইয়া দিত।

নির্ম্মলা ঢাকা বালিকা-বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িত। আমি যখন রাত্রে কাননপ্রান্তবর্ত্তী নীচের ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিতাম সে আপনা হইতে আসিয়া তক্তার উপর উপুড় হইয়া আমার কাছে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইত,—কেবলি যে, পড়াশুনার কথা হইত বলিলে মিথ্যা হয়, গল্প গুজব অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথাও হইত।

আমি তাহার পড়া বলিয়া দিতাম,—সেও আমার অনেক করিয়া দিত;—লিখিতে লিখিতে পেন্‌সিল ভাঙ্গিয়া গেলে তাড়াতাড়ি ছুরি দিয়া কাটিয়া দিত, অভিধানের দরকার হইলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেল্‌ফ্‌ হইতে ভারী ওয়েব্‌-ষ্টারটা দুই হাতে প্রাণপণে ধরিয়া আমার কাছে আনিয়া উপস্থিত করিত। তখন ঝিল্লিমুখরিত পুষ্পগন্ধভরা নিভৃত নিশীথে পিতৃ-অন্ন-প্রতিপালিত আশ্রিতের প্রতি একটি বালিকার এই স্নেহানুরাগে আমার মনের ভাব কিরূপ হইত, তাহা ভুক্তভোগী যাহারা, তাহারাই বুঝিতে পারিবে।

সংক্ষেপে বলাই ভাল—নির্ম্মলাকে খুব ভালবাসিতাম, নির্ম্মলাও আমাকে ভালবাসিত। অম্বিকা বাবু মনে মনে সব বুঝিতেন। আমি ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্‌ পাশ করিলে একদিন তিনি আমাকে ডাকিয়া স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "তোমাদের পরস্পরে যেরূপ অনুরাগ, আমার ইচ্ছা, তুমি বি-এ পাশ করিলেই নির্ম্মলার সহিত তোমার বিবাহ দিই।" শুনিয়া আমি হাতে যেন চাঁদ পাইলাম। নির্ম্মলাকে একথা জানাইলাম।

আমি বি-কোর্সে পড়িতাম। একদিন কালেজে রাসা-য়নিক পরীক্ষা করিতে করিতে হঠাৎ একটা কাঁচের পাত্র

সশব্দে ফাটিয়া গিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া ক্ষত করিয়া ফেলিল। আমি যন্ত্রণায় অজ্ঞানপ্রায় হইয়া পার্শ্বের চৌকিতে এলাইয়া পড়িলাম;—তাহার পর স্বপ্নের মত অস্পষ্ট অনুভব করিলাম—কালেজের প্রিন্সিপাল সাহেব আসিল, আমাকে চৌকি-সুদ্ধ উঠাইয়া গাড়িবারান্দায় লইয়া গেল, এবং ধরাধরি করিয়া গাড়িতে পূরিল। কিন্তু তাহার পর যে কি হইল জানি না।

আমার জ্ঞান হইয়া দেখিলাম, আমি হাঁসপাতালে পড়িয়া আছি—অম্বিকাবাবু আমার পাশে দাঁড়াইয়া, এবং একজন ডাক্তার আমার ক্ষত-স্থানে ঔষধ দিতেছে। আমি দুই দিন হাঁসপাতালে রহিলাম। তৃতীয় দিনে অম্বিকাবাবু আমাকে বাড়িতে লইয়া গেলেন। নির্ম্মলা আমাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম, কোন ভয়ের কারণ নাই, শীঘ্রই সারিয়া উঠিব। নির্ম্মলার চোখে আর ঘুম রহিল না;—"ব্যথাটা কি একটু কম মনে হচ্চে?" "আর একবার ঔষধ লাগাইয়া দিই?" "ফুলোটা ত একটু কম দেখাচ্চে।" দিবারাত্রি তাহার মুখে এই বুলি ছিল। নির্ম্মলার শুশ্রূষাগুণে আমিই শীঘ্রই সারিয়া উঠিলাম, কিন্তু আমার মুখখানা চিরকালের জন্য মুখপোড়া হনুমানের মত কুশ্রী কদাকার হইয়া গেল। প্রথম যে দিন

আয়নায় আমার মুখ দেখি, নিজের চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

এই ব্যাপারের কিছু দিন পর হইতে অম্বিকাবাবুর কেমন ভাবান্তর দেখিলাম। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ যত্ন হঠাৎ যেন কমিয়া গেল। নির্ম্মলাও আমার কাছে বড় একটা আসিত না—পড়া জিজ্ঞাসা করিতেও না। তাহার কাছেই শুনিলাম বাবা তাহাকে বারণ করিয়া দিয়াছেন। আমি বুঝিলাম, আমার এই পোড়ামুখই সকল অনিষ্টের মূল।

এক দিন কালেজ হইতে আসিয়াছি। অম্বিকাবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি কলিকাতায় বদ্‌লী হইয়াছি। সাত দিনের মধ্যে আমাকে কাজে যোগ দিতে হইবে। তুমি তোমার বাড়িতে উঠিয়া যাও। যত দিন তুমি পড়াশুনা করিবে, কিম্বা একটা কাজকর্ম্ম না পাও, আমি মাসে মাসে তোমার খরচ পাঠাইব।"—শুনিয়া, নির্ম্মলাকে আর দেখিতে পাইব না—আমার বুকের ভিতর যেন শুকাইয়া গেল।

অম্বিকাবাবুর কলিকাতায় যাইবার আগের দিন আমি নিজের বাড়িতে উঠিয়া গেলাম। সন্ধ্যার সময় ভাঙা বাখারির বেড়াটা ধরিয়া বাড়ি পরিষ্কার করাইতেছি, এমন

সময় দেখি, নির্ম্মলা আস্তে আস্তে আমার দিকে আসিতেছে। মুখখানি বড় ম্লান। আমার কাছে আসিয়া সে বলিল, "আমাদের কাল আর রাত্রে যাওয়া হইল না, ভোরেই যাইতেছি। আর বোধ হয় দেখা হইবে না, তাই শেষ দেখা করিতে আসিয়াছি।"—খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"আমার আর একটি ভিক্ষা আছে। আমি আমার জন্মদিনে মায়ের কাছে যে টাকা পাই তাহা জমাইয়া জমাইয়া একশত টাকা করিয়াছি—তাহা আপনার খরচের জন্য আমি অর্ঘ্যস্বরূপ আনিয়াছি—আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে।" আমি তাহার কাছ হইতে টাকা লইতে সঙ্কুচিত হইতেছি—দেখিলাম, তাহার চোখ দিয়া বড় বড় দুই ফোঁটা জল পড়িল। আমি অগত্যা টাকা লইলাম। নির্ম্মলা বলিল, "আর থাকিতে পারিব না—বাবা টের পাইলে আর রক্ষা রাখিবেন না। আমি আজ আপনার কাছে শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনাকে ছাড়া জীবনে আর কাহাকেও বিবাহ করিব না—চলিলাম—বিদায়!"—সে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "আমিও তোমার গা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি, তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না।" তাহার পর দেখিলাম অশ্রুজলের ভিতর হইতে

আমাকে বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া নির্ম্মলা অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল। আমি ঘর হইতে ছুরি আনিয়া এই দিনটাকে স্মরণে রাখিবার জন্য সন্ধ্যাকাশতলে দাঁড়াইয়া বাবলাগাছে খুদিয়া রাখিলাম—"১০ই আষাঢ়, সোমবার, ১৮৭৯।" সে দিন বেড়াইতে বেড়াইতে বাবলাগাছের এই লেখাটাই চোখে পড়িয়াছিল।

সবটা শেষ করাই ভাল। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি বি-এ পাশ করিলাম, তাহার পর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য পরীক্ষা দিলাম, এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটিগিরি করিতে লাগিলাম। অনেকবার অনেক স্থানে বদ্‌লী হইয়া শেষে চট্টগ্রামে প্রেরিত হইলাম। বলিতে লজ্জা বোধ হইতেছে—ইতিমধ্যে আমি বিবাহ করিলাম, অনেকগুলি ছেলে মেয়েও হইল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীপুত্রপরিবৃত হইয়া আমার বাংলার সম্মুখের বাগানে বসিয়া একটা বাঙ্গালা খবরের কাগজ পড়িতেছি। ছেলেরা চীৎকার রবে বল খেলা করিতেছে। দূরে নদীতে নৌকা ভাসিয়া যাইতেছে। চারিদিকে ছোট ছোট শৈলমালা প্রকৃতির শ্যামল বসনাবৃত স্তনের মত দেখাইতেছে। কাগজ পড়িতে পড়িতে হঠাৎ দেখিলাম, এক স্থানে লেখা আছে—"ভীষণ লোমহর্ষণ

ব্যাপার ! অগ্নি-পরীক্ষা !—পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পাবে পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছি গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচাবী ৺অম্বিকাচরণ ঘোষাল মৃত্যুকালে উইলে তাঁহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি দুই পুত্রকে দিয়া যান, এবং তাঁহার কন্যা নির্ম্মলা দেবীর এই ব্যবস্থা করেন যে, তিনি যতদিন বিবাহ না করিবেন বাটীতে থাকিয়া ন্যায্যমত ভরণপোষণ পাইবেন। অম্বিকাবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগ্নীকে বাটী হইতে তাড়াইবাব মতলবে তাহাকে সর্ব্বদাই বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি কবিত। নির্ম্মলা দেবী কোনমতেই বিবাহ করিতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে জ্যেষ্ঠভ্রাতা নানারকমে তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল। আজ দুই দিন হইল জ্যেষ্ঠ উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা ভগ্নীর সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ করিয়া দেয়—তাহাতেই ধনুষ্টঙ্কার বোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।”—

কাগজ খানা আমার হাত হইতে পড়িয়া গেল। আমি উঠিয়া ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমার মনে হইতে লাগিল যেন পৃথিবীর সমস্ত চেতন অচেতন পদার্থ চারিদিক হইতে গুটাইয়া আসিয়া আমার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া একস্বরে বলিতেছে—“রে শিক্ষিত পুরুষসিংহ! তুমি ত বিবাহ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া বেশ আনন্দে আছ—আব ঐ অবলা দেখ তোমারি আশায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ দিল তবু পণ

ভঙ্গ করিল না! লজ্জাও নাই! ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!—আমার যেন দম্ আট্‌কাইয়া আসিতে লাগিল। ছেলেরা ডাকিতে লাগিল—"বাবা আজ আর আমাদের সঙ্গে বল খেলা কর্‌বে না?"—আর বাবা!—আমি সাত দিন বিছানা হইতে উঠিতে পারি নাই।

মা ও ছেলে

ছোট পল্লীগ্রামে ছোট্ট একখানি কুটীর—তাহাতে বাস করিত মা ও ছেলে।

মা ধান ভাণে, ছেলে ধানগুলি ধামায় কুড়াইয়া রাখে। মা রাঁধে ছেলে তরকারী কুটিয়া দেয়। মা যখন সেলাইয়ের কাজ লইয়া বসে, ছেলে তখন প্রথম ভাগ লইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। মা যখন রোগে পড়ে, ছেলে তখন প্রাণপণে মায়ের সেবা করে, আপন হস্তে মাকে রাঁধিয়া খাওয়ায়। এমন করিয়া সে মায়ের কাছে শিশুশিক্ষা ও শিশুজীবন দুইই শেষ করিয়াছিল।

ছেলেবেলায় নাকি বিনয় কুমারের নাসিকা একটু অপ্রতুল ছিল, মা তাই আদর করিয়া ডাকিত—খ্যাঁদা।

মায়ের কেমন করিয়া দিনপাত হইত, খ্যাঁদা অতটা বুঝিত না। ক্ষেতে আলু, মূলা, শাকসব্জি হইত, সে ধামা পূরিয়া তুলিয়া আনিত, মাঠে ধান হইত, দীনে চাষা গরুর গাড়ী করিয়া বাড়ীতে দিয়া যাইত। খ্যাঁদা তার বেশী আর কিছু জানিত না।

খ্যাঁদা আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মা ছাড়া আর কাহাকেও চিনিত না, মা কথাটি ছাড়া আর কোন কথা

জানিত না। যখন খিদে পাইত, খ্যাঁদা আস্তে আস্তে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মায়ের মুখে মুখ রাখিয়া ডাকিত, মা! মা অম্‌নি বলিত, খ্যাঁদা তোর খিদে পেয়েছে? পিঁড়িটা টেনে নিয়ে বস্‌। আমার রান্না হয়েছে, দিচ্ছি। যদি তার অসুখ করিত, সে আস্তে আস্তে আসিয়া মা'র কোলে শুইয়া পড়িত—মা'র একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে রাখিয়া ডাকিত, মা! মা অম্‌নি তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিত, বলিত, খ্যাঁদা, তোর অসুখ করেছে—চল্‌ শুইগে যাই। সেদিন মা কিছু খাইত না। রাত্রে যদি হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, খ্যাঁদা মায়ের কোল ঘেঁসিয়া দুই হাতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিত, মা!—মা! মা অম্‌নি তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইত, বলিত, ভয় কি! খ্যাঁদা তখনি আবার নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িত।

খ্যাঁদা একদিন মাত্র পাঠশালা গিয়াছিল। তাহার মা পূর্ব্বরাত্রে নূতন শরের কলম, পরিষ্কার তালপাতা, নূতন দোয়াত যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল। খ্যাঁদা ভোর বেলায় উঠিয়া, স্নান করিয়া, নূতন কাপড় পরিয়া মা'র হাতে খাবার খাইল। পরে মাকে প্রণাম করিয়া জনৈক প্রতিবেশী বালকের সহিত গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে সমস্তক্ষণ খ্যাঁদা মা'র কথা ভাবিতেছিল। মা এতক্ষণ ডাল সাঁতলাইয়া ঝোল চড়াইয়া দিয়াছেন। এবার মা ঝোলে পাঁচফোড়ন দিলেন। এতক্ষণে মোচার-ঘণ্ট চড়িল। হলুদ বাটা ঠিক্ আছে ত? খ্যাঁদা কাল ত হলুদ বাটে নাই।--এত নিবিষ্টচিত্তে খ্যাঁদা মায়ের রান্না ও নিজের হলুদ বাটার কথা ভাবিতেছিল যে, গুরুমহাশয় যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অনুসন্ধানে' অনু'র পর কি হবেরে? তখন খ্যাঁদা তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, হলুদ বাটা। পাঠশালাসুদ্ধ বালকের হাসিতে তাহার চমক ভাঙ্গিল। গুরুমহাশয় চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বজ্র গম্ভীরস্বরে বলিলেন, উঠে আয়, তোর পিঠে হলুদবাটা লঙ্কা ফোড়ন দিই আয়!

খ্যাঁদা তারপর হইতে আর পাঠশালায় যায় নাই। তাহার পিঠে অনেকদিন পর্য্যন্ত গুরুমহাশয়ের লঙ্কা ফোড়নের দাগ ছিল।

২

সেদিন অপরাহ্ণে খ্যাঁদা মা'র সঙ্গে নদীর ধারে গিয়াছিল। তাহার মা গা ধুইয়া কাপড় কাচিতে ছিল, সে নদীর পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া নৌকাদের আনাগোনা

দেখিতেছিল। আকাশের কোলে মেঘ জমিয়াছিল—লাল, নীল, পীত, নানা রঙের মেঘ।

একটি লোক খ্যাঁদার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। খ্যাঁদাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম খ্যাঁদা? খ্যাঁদা ঘাড় নাড়িল লোকটি বলিল, ঐ তোমার মা? খ্যাঁদা পুনরায় ঘাড় নাড়িল। তখন লোকটি আর কিছু না বলিয়া সেই-খানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খ্যাঁদার মা কাপড় কাচিয়া কলসী কক্ষে যখন উপরে উঠিল, লোকটি তাহার সঙ্গ লইল।

খ্যাঁদার মা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে?

লোকটি বলিল, এই তোমার ছেলে?

খ্যাঁদার মা বলিল,—হাঁ।

লোকটি বলিল তুমি বড় গরীব?

খ্যাঁদার মা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল!

লোকটি বলিল, তোমার ছেলেটির যদি একটা উপায় হয় তা'তে তোমার কোন আপত্তি আছে?

খ্যাঁদার মা বলিল, কি রকম।

লোকটি বলিল, রাজার মতন সুখে থাকবে, বড় হ'লে মস্ত জমীদারী হাতে পাবে।

খ্যাঁদার মা বলিল, আমার খ্যাঁদাকে দেবে?

লোকটি বলিল, রাজপুরের জমীদার পোষ্যপুত্র নিতে চান। তোমার ছেলেটি বেশ লক্ষণ-যুক্ত, দেবে কি? একবার দেখিয়ে আন্‌ব।

খ্যাঁদার মা ভাবিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিল।

লোকটি বলিল, কি বল?

খ্যাঁদার মা বলিল, কাল সকালে এস।

সন্ধ্যার সময় খ্যাঁদার মা খ্যাঁদাকে কাছে বসাইয়া পরিপাটিরূপে খাওয়াইল। শাক, শুক্তানি, মাছের ঝাল, মোচার ঘণ্ট, চিঁড়ার পায়েস--

ছেলে যা যা খাইতে ভালবাসিত, সেদিন মা সব রাঁধিল।

ছেলে বলিল, মা আজ কিসের ভোজ—এত রেঁধেছিস্ কেন?

মা বলিল, তোর মাসী ডেকে পাঠিয়েছে,—কাল সকালে নিতে আস্‌বে। আজ ঘরে যা'ছিল খাইয়ে দিলুম।

ছেলে বলিল, তুই যাবি ত?

মা বলিল, আমি কাজ সেরে পরে যাব।

মা রাত্রে ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া শুইল। ছেলে ঘুমাইল। মা অনেক ভাবিল, অনেক কাঁদিল, শেষে খ্যাঁদাকে লোকটির সঙ্গে পাঠাইয়া দিতে মনস্থ করিল।

সকাল বেলা ছেলে যাইবার সময় মাকে বলিল, মা কাজ সেরে শীগ্‌গির আসিস্‌! তা'না হ'লে আমি থাকব না। মা বলিল, আচ্ছা।

জমীদার বাড়ি গিয়া ঘরদোর জিনিষপত্তর, বাগান, পুকুর, লোক লস্কর, হাতি ঘোড়া দেখিয়া খঁ্যাদার ভ্যাবা-চ্যাকা লাগিয়া গেল। সে বিস্ফারিত নেত্রে ভয়ে জড়সড় হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অন্তঃপুরে তাহাকে দেখিয়া সাড়ি পরা গহনা পরা পাড়ার বৌ ঝি গিন্নিরা আসিয়া তাহাকে কোলে করিয়া, গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া "বাঃ দিব্যি ছেলেটি।" বলিয়া আদর করিতে লাগিল। খঁ্যাদা, মা, মা, বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সকলে জমীদার-গিন্নিকে দেখাইয়া "ঐ তোমার মা! ওঁকে মা বল" বলিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খঁ্যাদা আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—আমি বাড়ী যাব, মার কাছে যাব,—আমাকে মার কাছে দিয়ে এস, তোমরা আমার মার কাছে দিয়ে এস।—কেহ আর এক মুহূর্ত্তও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

খঁ্যাদা যখন বাড়ী ফিরিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোক মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে মা'র সঙ্গে একটিও কথা কহিল

না, দাওয়ার একাকোণে গিয়া চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মা আসিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, কি হয়েছে খ্যাঁদা? এত কাঁদাচিস্ কেন? খ্যাঁদা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিল, মাসী বাড়ী—তুই মিথ্যে বলেছিস্!—আর আমি যাব না, কখ্‌খনো না! আমি আর কাউকে মা বল্‌ব না—তুই আমার মা! তুই আমার মা!

তখন বাতাসে নৌকা হইতে গান ভাসিয়া আসিতে লাগিল:—

মা তোমার ঐ তারা, চন্দ্রচূড়দারা,
চন্দ্রদর্পহরা চন্দ্রাননী।
এমন রূপ দেখি নাই কার, মনের অন্ধকার
হরে মা তোর হর-মনোমোহিনী।

বুড়ী

শীতকাল। রাত্রি দুইটা। সমস্ত দিনের এবং অর্দ্ধেক রাত্রের হট্টগোলের পর কলিকাতা সহরের একটু তন্দ্রা আসিয়াছে। এখনও দুই হাত অন্তর গ্যাসের আলো এবং মাঝে মাঝে দুই একখানি গাড়ীর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ, তাহার অকাতর নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। রাস্তায় পাহারাওয়ালা রকের উপর বসিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া ঢুলিতেছে। তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত আর কিছুতে নয়, হঠাৎ ইন্‌স্পেক্‌টর বাবুর ভীমমূর্ত্তিসন্দর্শনের ভয়ে। দুই একখানা খাবারের দোকান এখনও খোলা আছে। তাহার সম্মুখে বুভুক্ষু রাস্তার কুকুর জিহ্বা বাহির করিয়া কাঙালের মত ফিরিতেছে। এমন সময়ে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের ফুটপাত দিয়া একটি বৃদ্ধা দাসী সর্ব্বাঙ্গ শালে জড়াইয়া এক বৎসরের একটি ছোট মেয়েকে কোলে লইয়া আস্তে আস্তে চলিতেছিল, আর মাঝে মাঝে বলিতেছিল, "ভগবান শীগ্‌গির শীগ্‌গির আরাম করে' দাও!" বৃদ্ধা যখন আমহাউসের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন একজন পাহারাওয়ালা তাহাকে চোর ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, বুড্‌ঢি এৎনা রাতকো কেয়া লেকে যাতি হো?" বুড়ী বলিল, "বাবা, আমি চোর নই, এই

আমার মনিব শ্যামবাবুর মেয়েটির বড় অসুখ, ডাক্তার বলেছে ভোরের হাওয়া খেলে তার সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে' তাই তাকে নিয়ে হাওয়া খাওয়াতে এসেছি।" প্যাহারাওয়ালা বলিল, "কেয়া তুম্ পাগলী হ্যায়, আভিতো দো বাজা হোগা!" বুড়ী বলিল, "বাবা জ্যোৎস্নায় ফর্‌সা দেখে সময় ঠাওরাতে পারি নি।"—বলিয়া মেয়েটিকে বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া "তাই ত কি কর্‌লুম" বলিতে বলিতে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। বাড়ী গিয়া মা বাপের অজ্ঞাতসারে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া আপনিও পাশে শুইল।

সেই দিন ভোরের দিকে মেয়েটির জ্বর বাড়িয়া গেল, অন্য দিন অপেক্ষা কিছু বেশী ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বুড়ী সভয়ে মেয়েটির গায়ে হাত দিয়া যখন দেখিল যে গা আগুনের মত তাতিয়াছে, তখন তাহার সেই কঙ্কালসার দেহের সমস্ত রক্ত যেন শুকাইয়া গেল। তাহাকে কোলে করিয়া সে একবার বসে, একবার ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়ায়, মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, পাখা করে, মুখে কপালে গায়ে বার বার হাত দিয়া দেখে, এতক্ষণে যদি জ্বর একটু কমিয়া থাকে। কিন্তু জ্বর আর কমিল না। সকাল হইলে বুড়ী মেয়েটিকে তার মায়ের কাছে রাখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে

নিকটস্থ ঠাকুরবাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের চরণামৃত আনিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল। তাহার পর মায়ের কোল হইতে লইয়া মেয়েটিকে কোলে করিয়া ঠায় বসিয়া রহিল।

ডাক্তার আসিলে বুড়ী অতি কাতর ক্রন্দনস্বরে বলিল, ‘বাবা আমার দোষেই মেয়েটির জ্বর বেড়েছে। বুড়ী মানুষ চোখে দেখ্‌তে পাইনে, ভোর ভেবে রাত দুটোর সময় মেয়েকে রাস্তায় নিয়ে বেরিয়েছিলুম। ডাক্তার মশায় আপনার পায়ে পড়ি, মেয়েটিকে ভাল করে’ দাও, ভগবান আপনার ভাল কর্‌বেন!”—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তার কহিলেন, “দূর পাগ্‌লী কাঁদিস্‌ কেন, কি হয়েচে?”—ডাক্তারের সান্ত্বনায় বুড়ীর কান্না আরও বাড়িল। সকলে মিলিয়া অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইল।

সে দিন বুড়ীকে কেহ কিছু খাওয়াইতে পারিল না।

বুড়ী অনেক কালের পুরাণো লোক। মেয়ের মা হেমাঙ্গিনীকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, এখন তাহার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া তাহার মেয়েটিকে আবার মানুষ করিতেছে। সন্তানের মুখ দেখিতে হেমাঙ্গিনীর বরাবর সাধ ছিল। যদি বা অনেক কষ্টে সে সাধ মিটিল, একটি মেয়ে হইল, সে আবার অদৃষ্টক্রমে

জ্বররুগ্না। হেমাঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রাত জাগিয়া শরীর খাটাইয়া বুড়ী মেয়েটিকে মানুষ করিতেছে। মেয়েটির প্রতি তাহার এতদূর স্নেহপক্ষপাত ছিল যে, তাহার জন্য অন্য শিশুর কাপড় কিম্বা দুধ যখন যাহা আবশ্যক হইত, কাড়িয়া লইয়া আসিত, কিন্তু অন্য কেহ যদি আবশ্যকবশতঃ বুড়ীর আদরের মেয়েটির কিছু লইতে আসিত, অম্‌নি সে ব্যাঘ্রিনীর মত তাহাকে খাইতে যাইত।

মেয়েটির জর কিন্তু কিছুতেই কমিল না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বুড়ী তাহার সঞ্চিত মাহিনার টাকা হইতে একটি সোনার মাদুলি গড়াইয়া তাহার মধ্যে ঔষধ পূরিয়া মেয়েটির হাতে বাঁধিয়া দিল। বিকাল বেলায় ডাক্তার আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন যে, টাইফয়েডের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে;—তিনি মাথায় বরফ দিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনী কাঁদিতে লাগিল। বুড়ী সজল নয়নে শুষ্কহস্তে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদিস্‌নে মা শীগ্‌গিরই ভাল হয়ে যাবে। ডাক্তার যা বল্‌চে তাই কর্‌ মা!"—বলিয়া বাহিরে আসিয়া দুই গণ্ড ভাসাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনের উদ্বেগে অনাহারে অনিদ্রায় বুড়ীর বুকের

পাঁজরে শেষে এমনি ব্যাথা ধরিল যে, তাহার আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। শুইয়া শুইয়া সে কেবলই মেয়েটির দিকে দৃষ্টি রাখিত। "ওগো মেয়েটা ভিজেতে পড়ে আছে, উঠিয়ে নাও।" "ওগো মেয়েটার ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও।" "ওগো মেয়েটাকে একটু বাতাস কর।"—চব্বিশ ঘণ্টাই এইরূপ চীৎকার করিত। কিছু দিনের জন্য নূতন দাসী আনিবার কথা যদি হেমাঙ্গিনী বলিত, অমনি সে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া একেবারে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া খুকিকে কোলে করিয়া বসিত। "না গো না, নতুন দাসী আন্‌তে হবে না, আমিই সব কাজ কর্‌তে পারব।" আর কেহ যে অসুখের সময় মেয়ের সেবা করিবে, বুড়ীর প্রাণে তাহা সহ্য হইত না।

ক্রমে মেয়েটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিল। সেদিন দুপুর রাতে মেয়েটি সজোরে মাথা চালাইতে লাগিল, তাহার চোখ দুটা উল্টাইয়া আসিল, দাঁতে দাঁতে লাগিতে লাগিল। ডাক্তারের জন্য লোক পাঠান হইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন গতিক মন্দ—বাঁচান দুরূহ। অন্য কোন ঔষধ নাই, চোখে মুখে মাথায় বরফ ঘসিয়া দিতে বলিয়া ডাক্তার অল্পক্ষণ পরে চলিয়া গেলেন। হেমাঙ্গিনী বারাণ্ডায় লুটাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

বুড়ী মেয়েকে কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মাথায় মুখে কম্পিতহস্তে বরফ ঘসিয়া দিতে লাগিল।

কিছুতেই কিছুই হইল না। ভোর চারিটার সময় বুড়ীর কোলে মেয়েটি মারা গেল। "ওরে আমার সোনা, ওরে আমার ধন, ওরে তুই কোথা গেলিরে, আমার দোষে এমন হলরে—ওরে ফিরে আয়রে, আমি কেমন করে বাঁচ্‌বো!"—বলিয়া চীৎকারস্বরে বুড়ী কাঁদিতে লাগিল! মেয়েটিকে সে কোনমতেই কোল হইতে ছাড়িবে না, সকলে মিলিয়া অনেক কষ্টে তাহার দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে তাহাকে কাড়িয়া লইল।

তিন দিন বুড়ী জলস্পর্শ করিল না, কেবলি কাঁদে। চতুর্থ দিনে সকলে মিলিয়া ধরিয়া বাঁধিয়া তাহাকে একটু দুধ খাওয়াইয়া দিল। দুই চারি দিন পরে বুড়ীর একটু জ্বর দেখা দিল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই জ্বর ঘোর বিকারে দাঁড়াইল। প্রলাপে সে কেবলই বকিত, "ওরে আমার দোষে গেলিরে!" অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়া অনেক করিয়া সে যাত্রা বুড়ী রক্ষা পাইল বটে কিন্তু তাহার সেই মনের আগুন কোন মতে নিবিল না।

জ্বর হইতে উঠিয়া মুণ্ডিত মস্তক, লোল চর্ম্ম, শ্বেত ওষ্ঠ, পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখ, অস্থিপঞ্জরসার ক্ষীণদেহ লইয়া বুড়ী যখন

হেমাঙ্গিনীর ঘরে প্রবেশ করিল, তখন উদ্বেলিত শোকাশ্রু ধারায় দু'জনে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কিন্তু ধ্বনি প্রতিধ্বনির ন্যায় হেমাঙ্গিনী বুড়ীর শোকাশ্রু আর থামে না। হেমাঙ্গিনীর স্বামী দেখিলেন, দু'জনে কাছাকাছি থাকিলে কখনও কাহারও শোকের লাঘব হইবার সম্ভাবনা নাই, উপরন্তু, উভয়েরই শরীরের পক্ষে যথেষ্ট হানি হইবার সম্ভাবনা। ভাবিয়া চিন্তিয়া হেমাঙ্গিনীর স্বামী স্থির করিলেন, বুড়ীকে চার টাকা করিয়া পেন্‌সন্‌ দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিবেন। বুড়ী শুনিয়া হেমাঙ্গিনীকে ফেলিয়া কোন মতেই বাড়ী যাইতে রাজি হইল না। বাবু অনেক করিয়া বুঝাইয়া শুঝাইয়া কিছুদিন পরে চিঠি দিয়া আবার তাহাকে ডাকাইয়া আনিবেন বলিয়া, তাহাকে বাড়ী যাইতে সম্মত করাইলেন।

শরীরে যখন একটু বল পাইল, বুড়ী বাড়ী যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। যাইবার আগের দিন রাত্রে তাহার জিনিস পত্তরগুলো একটা পুঁট্‌লি করিয়া বাঁধিল, গলার সোনার হারটি খুলিয়া হেমাঙ্গিনীকে দিল। ভোর চারিটার সময় উঠিয়া হেমাঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী হইতে বাহির হইল।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের সেই পথ। সহর নিস্তব্ধ। ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ। কাঁখে পুঁটুলী, "মাগো কি হোল গো!" বলিতে বলিতে অসহ বেদনাভার লইয়া বুড়ী ফুট্‌পাতের উপর দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। আমহাউসের কাছে যখন আসিল, সেই পূর্ব্বপরিচিত পাহারাওয়ালা তাহাকে দেখিতে পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বুড্‌ঢি আজ ফের্ কেয়া লেকে কাঁহা যাতি হো?" বুড়ী বলিল, "বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে, আমার সেই শ্যামবাবুর মেয়েটি মারা গেছে,—আমি চোর নই বটে, কিন্তু আমি খুনী, আমার দোষেই সে মারা গেছে, আমাকে ধরিয়া তোমাদের জেলে দাও!"—বলিয়া অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইয়া বসিয়া পড়িল। পাহারাওয়ালা অনেক সান্ত্বনা দিয়া অনেক বুঝাইয়া তাহাকে উঠাইল, এবং সঙ্গে করিয়া খানিক দূর রাখিয়া আসিল। সে আস্তে আস্তে শিয়ালদহ অভিমুখে চলিতে লাগিল। টিকিট্ কিনিয়া ছয়টার ট্রেনে বাড়ী রওনা হইল।

একমাস পরে খবর আসিল, বুড়ী দেশে জ্বরবিকারে মারা গিয়াছে।

সহধর্ম্মিণী

শ্রীভগবানুবাচ ।—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্ ।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ।—হে পার্থ, আত্মনি এব, কিনা পরমানন্দরূপে, আত্মনা কিনা স্বয়মেব—"

"তোমার ব্যাখ্যা ট্যাখ্যা রেখে দাও । তুমি একটু মিষ্টি সুর করে পড়,—আমি শুনি ।"

"দেখ শৈল, তোমাকে এত করে' বোঝালুম, তবু তোমার একটুও চৈতন্য হ'ল না । তুমি আমার সহধর্ম্মিণী, কোথায় আমার ধর্ম্মকর্ম্মে সহায়তা করবে, আমার পর-কালের সদ্গতির জন্য চেষ্টা করবে, তা না, তোমার কেবল চেষ্টা আমাকে মায়াজালে জড়িত করে' রাখবে । সাধে শাস্ত্রে বলে—কামিনী কাঞ্চন বিষবৎ পরিত্যজ্য ।"

"পরিত্যাগ করতে হয় সকাল বেলা কোরো ; এখন রাত বারোটা, একটু ঘুমোতে দাও ।" এই বলিয়া শৈল তাম্বূলগন্ধামোদিত অধরপ্রান্তের একটি ফুৎকারে আলো নিবাইয়া খাটে গিয়া শুইয়া পড়িল ।

"গুরুদেব, অবলাকে সুমতি দাও," বলিয়া উপেন আলো জ্বালাইয়া পুনরায় পড়িতে বসিলেন।

কালীঘাটে উপেনের গুরু বাস করেন। নাম বিমল। গুরুই বল আর বয়স্যই বল, উপেনের ইনি সবই। প্রেসি-ডেন্সি কালেজে যখন এক সঙ্গে পড়িতেন, তখন হইতেই দুই জনে খুব মাথামাথি সৌহার্দ্দ্য ছিল। তখন বিমল সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যের এক জন খুব গোঁড়া ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিল; এমন কি, এক সময়ে কালেজের কোন ছাত্র সুরেন্দ্র বাবুর নিন্দা করাতে বিমল তাহাকে ঘুষি মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু পলিটিক্‌স্ শেষে গীতা ও বেদান্তদর্শনে পর্য্যবসিত হইল। কালেজ ছাড়িয়া উপেন কণ্ট্রোলার আফিসে ঢুকিল, বিমল সংসারের অসারত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভগবচ্চিন্তা ও শাস্ত্রালোচনায় মনোনিবেশ করিল।

বিমলের পিতা বড়মানুষ। ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন দেখাইয়া ও নানারূপ চেষ্টা করিয়াও তিনি পুত্রকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিতে পারিলেন না। বিমল সমস্ত ত্যাগ করিয়া কালী-ঘাটে গঙ্গার ধারে একটি পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য সাধু সন্ন্যাসীর ন্যায় বিমলের কোন বাহ্যিক ভড়ং ছিল না। গৈরিক বসন, কমণ্ডলু, ছাইভস্মের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। সংসারী ভদ্রলোক যেরূপ

ধুতি জামা পিরাণ পরে, বিমলও তাহাই পরিত। এই জন্য উপেন তাহাকে আরও শ্রদ্ধা করিত। উপেনকে বিমল যে কি যাদুমন্ত্রে বশীভূত করিয়াছিল, লোকে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। বিমল উঠিতে বলিলে উপেন ওঠে, বিমল বসিতে বলিলে উপেন বসে। বিপদ আপদে সমস্ত কাজে বিমলের পরামর্শ না লইয়া উপেন এক পাও চলে না। বিবাহের প্রতি বিমলের জাতক্রোধ ছিল, এবং উপেনকে বিবাহ করিতে অহর্নিশ নিষেধ করিত। কিন্তু ভবিতব্য কে রোধ করিবে? বৎসরেক পূর্ব্বে বিমল যখন পশ্চিমে তীর্থদর্শনে বাহির হইয়াছিলেন, উপেনের পিতা জোর করিয়া উপেনের বিবাহ দেন। বিমল তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন বিবাহের কথা শুনিল, আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, "উপেন, ভাই হে, সাধ করে' পাঁকে ডুব্‌লে!" উপেনও সেই অবধি, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ম্রিয়মাণ।

ভোর হইতে না হইতে উপেন বিমলের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ভাই বিয়ে করে' কি ঝক্‌মারিই করেছি। আমার ধর্ম্মজীবনটা একেবারে মাটী হ'ল! আমি যত দূরে দূরে থাক্‌তে চাই, আমার স্ত্রীর ততই আমাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা। আমার গীতা বেদান্ত-

দর্শন লণ্ডভণ্ড করে’ কোথায় যে ফেলে দেয়, তার ঠিক নেই। আজকাল আরও সাজসজ্জার দিকে বেশী মনোনিবেশ হয়েছে দেখ্‌ছি। বিকেল হ’লে লাল নীল কত রঙ বেরঙের ফিতে দিয়ে চুলটি বাঁধা আছে, ভিনোলিয়া সাবান নইলে মুখ ধোওয়া হয় না, এসেন্স্‌ মাসে তিন চার শিশি খরচ করচে। এ ছাড়া খোঁপায় বেলফুলের মালা, হাতে মেদিপাতার রঙ— আমি ত ভাই আর পেরে উঠ্‌চিনে, এখন উপায় কি?”

বিমল গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, “উপেন, সাবধান, সাবধান, মায়াকুহকে পড়িয়া যেন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইও না। স্ত্রীলোক হইতে শত হস্ত দূরে থাকিবে। ইহাতে যদি একান্ত নিষ্ঠুর হইতেও হয় তাহাও হইবে, তবু যেন পদস্খলন না হয়। তোমার স্ত্রীর বিলাসিতা নিবারণের উপায় সে ত তোমারই হাতে। তুমিই ত সংসারের কর্ত্তা, তোমার স্ত্রীর সমস্ত খরচপত্র বন্ধ করিয়া দাও। ধর্ম্মজীবনের সমস্ত কণ্টক নির্ম্মূল কর। যোগবাশিষ্ঠে রামচন্দ্র বলিয়াছেন,—

ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনং।
সমালোকয় রম্যং চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি॥

যুবতীর চর্ম্ম মাংস রক্ত বাষ্প বারি পথক করিয়া যদি

কোন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, তবে দেখিতে থাক, নচেৎ মিথ্যা মুগ্ধ হইও না।”

উপেন কহিল, “বিমল, তুমি ঠিক্ বলিয়াছ।” উপেন বাড়ী ফিরিয়া মাকে বলিল, “মা, আমার যা’ ইচ্ছা ক’রব, তোমরা আমাকে বাধা দিতে পারবে না। যদি বাধা দাও, আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব। আমি মাছমাংস খাব না, সমস্ত রাত ধরে’ যোগ অভ্যাস করব, তোমরা মাথা খুঁড়লেও তোমাদের কথা শুন্‌চিনে।”

বৃদ্ধা মাতা মুখখানি ভার করিয়া বলিলেন, “বাছা, তুমি যা’ ভাল বোঝো কোরো, আমরা আর কিছু বল্‌ব না।”

উপরে গিয়া উপেন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, “দেখ শৈল, আমার সঙ্গে এ রকম ফচ্‌কিমি আর চল্‌বে না। এবারে যদি বই টই লুকিয়ে রাখ, হয় আমি বেরিয়ে যাব, নয় তোমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেব। এবার থেকে সাবান এসেন্স বাজে খরচের জন্য আর এক পয়সাও দিচ্চিনে।”

শৈল শান্তভাবে দৃঢ়স্বরে “আচ্ছা” বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

স্বামী আফিসে চলিয়া গেলে শৈল উপরে গিয়া আল-

আলমারী খুলিল। এসেন্স সাবান ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্য বাহির করিয়া ছোট ননদটিকে দিল। ধূলা ঝাড়িয়া উপনিষদ শঙ্করভাষ্য বেদান্তদর্শন প্রভৃতি যথাস্থানে গুছাইয়া রাখিল। গীতার যে কয় পাতা আল্‌গা ছিল, আটা দিয়া জুড়িয়া ঠিক করিয়া রাখিল। এই সকল কাজের মধ্যে দুই ফোঁটা চোখের জল ফেলিল।

আফিস হইতে আসিয়া উপেন যখন দেখিল শৈলের আর বেশপারিপাট্য নাই, এবং নিজের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পরিষ্কৃত হইয়া যথাস্থানে বিরাজ করিতেছে, তখন তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। সন্ধ্যার সময় যখন সাধু সন্ন্যাসীরা উপেনের বাড়ীটিকে মঠ করিয়া তুলিল, তখন উপেনকে অন্যান্য দিনের ন্যায় আর চায়ের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে হইল না; না বলিতে বলিতে যত পেয়ালা চা আবশ্যক অযাচিতভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কাহারও চায়ে চিনির বদলে নুণ কিম্বা দুধের অভাব লক্ষিত হইল না। শৈলের মতি ফিরিয়াছে, এই স্থির করিয়া, উপেন মনে মনে ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিল।

উপেন যখন এইরূপ সাধুসঙ্গ ধর্ম্মালাপে মগ্ন, শৈল শয়নগৃহে ধূনা জ্বালাইল। তাহার পর স্বামীর বসিবার

মৃগচর্ম্মখানি পাতিয়া সম্মুখে জলচৌকির উপর বইগুলা ঠিক করিয়া রাখিল। উপেন উপরে আসিয়া ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া যখন গীতাদিপাঠ আরম্ভ করিলেন, শৈল ঘরের চৌকাটে বসিয়া একমনে শুনিতে লাগিল। মাঝে একবার দক্ষিণে বাতাসের দমকা লাগিয়া আলো নিবিয়া গেল, শৈল তাড়াতাড়ি দেশ্‌লাই খুঁজিয়া জ্বালাইয়া দিল। রাত্রি দুইটার পর উপেন নীচের বিছানায় বিশ্রাম করিলে তবে শৈল স্বামীর পদপ্রান্তে মাদুর পাতিয়া শয়ন করিল।

অতি প্রত্যুষেই উপেন বিমলের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "ভাই! ওষুধ ধরিয়াছে। তোমার কথা মত কাজ করিয়া এক দিনেই শৈলের মতিগতির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি। তাহার সমস্ত চপলতা ধীর গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে। আমার সাধন পক্ষে আর কোনই ব্যাঘাত নাই।"—শুনিয়া বিমল খুব আনন্দিত হইল।

শৈল দাসীর ন্যায় সেবা করে, উপেন শাস্ত্রালোচনা করেন। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

বিমল এক্ষণে আর কালীঘাটে নাই। গয়ায় গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে দরিদ্র অনাথা বিধবা যাহারা তীর্থদর্শনে আসে, তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কেহ রোগে কাতর, রাস্তায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, মুখে এক ফোঁটা জল দিবারও লোক নাই। এরূপ অবস্থায় পাষণ্ড দুর্ব্বৃত্তেরা আবার অনেক সময়ে ইহাদের পুঁজিপাটা যাহা থাকে কাড়িয়া লয়। বিমল সহরের ধনীদের দ্বারে দ্বারে গিয়া বুঝাইয়া তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল! অবশেষে সকলের সাহায্যে ও নিজের যত্নে একটি আশ্রম ও দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিল। পিতার নিকট চিঠি লিখিয়া অর্থসাহায্যেরও বন্দোবস্ত করিল। স্কুলের ছাত্রেরা এই কার্য্যে তাহার বিশেষ সহায়তা করিল। তাহারা পথে পথে ঘুরিয়া বিপন্ন রোগী দেখিলেই কোলে করিয়া আশ্রমে লইয়া আসে।

একদিন সকাল বেলায় রোগীপরিদর্শন কার্য্যে বাহির হইয়া বিমল দেখিল, পথের ধারে গাছতলায় একটি সুন্দরী বালিকা মৃত প্রায় পড়িয়া আছে। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের

ন্যায় বলিলে ঠিক হইবে না,—নবোদ্ভিন্ন বৃন্তচ্যুত কুসুম ব্যতীত ইহার সৌন্দর্য্যের আর তুলনা সম্ভবে না!

বিমল ইহাকে আশ্রমে আনিল। তাহার অশ্রান্ত সেবা শুশ্রূষার গুণে বালিকা বাঁচিল। সুস্থ হইয়া গায়ে একটু বল পাইলে বালিকা বিমলকে বলিল, "দেখুন, আপনি আমার প্রাণদান করিয়াছেন, দয়া করে' আপনার সেবাব্রতে আমাকে দাসী নিযুক্ত করুন, আমি আর অন্যত্র যাইব না।" বিমল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, বালিকা অনাথা ব্রাহ্মণকন্যা এবং অবিবাহিতা।

বিমল এখন প্রায়ই কেমন অন্যমনস্ক হইয়া থাকে। পূজা আহ্নিকের তিন ঘণ্টা কাল এক্ষণে সংক্ষিপ্ত হইয়া পনের মিনিটে দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রগ্রন্থ প্রায় আর কুলুঙ্গি হইতে নীচে নামে না। বিমল বড় একটা বাড়ীর বাহিরও হয় না। বালিকাকে রোগমুক্ত করিতে গিয়া বিমল স্বয়ং উৎকট মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

আকাশের মেঘ যতক্ষণ পারে, বারিকণা বক্ষে ধরিয়া রাখে, কিন্তু শীতল বাতাস বহিলে জলভার ধারণ করিবার তাহার আর সামর্থ্য থাকে না। যত দিন পারিল, বিমল মনের আবেগ চাপিয়া রাখিল; কিন্তু অবশেষে যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, একদিন বালিকাকে ডাকিয়া বলিল,

"দেখ, আমাদের আর এরূপ ভাবে থাকা শোভা পায় না। আমি তোমাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি, কি বল?" বালিকা দুই গণ্ডে রক্ত ছুটাইয়া অধোবদনে মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

বিমল সমস্ত খুলিয়া পিতাকে একখানা চিঠি লিখিল। পিতা চিঠি পাইয়া আনন্দে আটখানা হইয়া সেই দিনেই গয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। গয়ায় পঁহুছিয়া দু' একদিনের মধ্যে পুত্রের বিবাহ দিলেন, এবং ক্রমে সংসারের ভারও তাহার উপর ন্যস্ত করিলেন।

৩

উপেন বিমলের বিবাহের কথা কিছুই জানিত না। সেদিন সকালে নীচের ঘরে তক্তার উপর বসিয়া উপেন জ্যোতিষ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিল, একাগ্রমনে গ্রহ নক্ষত্রের সহিত মানবজীবনের রহস্যময় সম্বন্ধনির্ণয়ে নিযুক্ত ছিল, এমন সময় গাড়ী করিয়া বিমল ও তাহার স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। উপেনকে দেখিয়া বিমল বলিল, "ভাই! তোমাকে সর্‌প্রাইজ্‌ কর্‌বার ইচ্ছা ছিল, তাই তোমাকে কিছু লিখিনি। আমি বিবাহ করিয়াছি, ইনি আমার স্ত্রী। সে সব অনেক কথা আছে, কাল আমাদের বাড়ী যেও, সব বল্‌ব। আমরা এখন ভবানীপুরে থাকি।"

বিমলের সমক্ষে উপেনের বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা সকলেই বাহির হইতেন। উপেন হতবুদ্ধি হইয়া বিমল ও তাহার স্ত্রীকে লইয়া উপরে গেল। শৈল খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বসাইল, এবং আলাপ পরিচয় কথাবার্ত্তার পর বাজার হইতে ভালো জলখাবার আনাইয়া খাইতে দিল। উপেন সমস্ত ক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া ঘরের একপার্শ্বে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। এক দিকে সালঙ্কারা সুবাসস্নাতা বিলাসিনী বিমলের স্ত্রী, অন্য দিকে বিরসবদনা দীননয়না তৈলহীনরুক্ষকেশ শৈল,—দুঃখ লজ্জা অনুতাপ ধিক্কারে উপেনের বক্ষের বাঁধন খসিয়া যাইতে লাগিল। বিমল জিজ্ঞাসা করিল, "উপেন যে এত চুপ্‌চাপ্? উপেন বলিল, "আমার শরীরটা ভাল নেই।"

বিমল ও তাহার স্ত্রী চলিয়া গেলে, উপেন, কি ভুলই করিয়াছি বলিয়া, দুই হস্ত প্রসারণ করিয়া আবেগকম্পিত-বক্ষে শৈলকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে গেল। শৈল ঘাড় ফিরাইয়া দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া বলিল, "আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, কুহকিনী বা মায়াবিনী নহি!" কোন মতেই চুম্বন করিতে দিল না।

সেবিকা

সিঁউতি গ্রামের মিউনিসিপাল কমিশনার রাধাকান্ত ঘোষ অপরাহ্ণে মিটিং হইতে বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, সদর দরজায় বড় বড় হাতের অক্ষরে লেখা "প্রবেশ নিষেধ"। রাধাকান্ত মনে মনে বুঝিলেন ইহা কাহার কাজ, সেইজন্য, ষড়রিপুর মধ্যে দ্বিতীয় রিপুটি সমধিক উত্তেজিত হইলেও তাহাকে মনের মধ্যে পরিপাক করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ তরুণী ভার্য্যা বিনোদিনীকে কহিল, "এ আবার কি হয়েচে? তোমার জ্বালায় দেখ্‌চি আমার আর মুখ দেখাবার যো রইল না, মান সম্ভ্রম সবি গেল!"

একগুচ্ছ লিচুফলের যে কয়টি অবশিষ্ট ছিল তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করিয়া বিনোদিনী কহিল, "তা বেশ, আমারি সব দোষ! তুমি সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত এ মিটিং ও মিটিং করে' বেড়াবে, আর পাড়ার রাজ্যির মেয়ে এসে আমাকে একলা পেয়ে বিরক্ত কর্‌বে! এই আজ দুপুরবেলায় খেয়ে দেয়ে সবে একটু শুয়েছি আর সিধুর মা এসে কত কি বল্‌তে লাগ্‌ল, সে আমাকে বল্‌লে কি না, 'তোমার স্বামীর কাজকর্ম্ম নেই, সংসার চলে কি করে'? মিউনিসিপালি থেকে নিশ্চয় দু'পয়সা উপরি পাওনা আছে।'

শুনে’ আমার এম্‌নি রাগ হ’ল, আমি তাকে স্পষ্ট বল্‌লুম আমাদের জন্যে তার মাথা ব্যাথা করাবার কোন আবশ্যক নেই, সে যেন আমাদের বাড়ীতে আর না আসে। তার পর ঠাকুরপোকে দিয়ে ঐটে লিখিয়ে টাঙ্গিয়ে দিয়েছি।”

ইহার উপর আর কথা চলে না। রাধাকান্ত তখন মনে মনে সিধুর মার মস্তক চর্ব্বণ করিতেছিলেন অথবা বিনোদিনীর সরল নিটোল ঢল ঢল মুখখানির কথা ভাবিতে-ছিলেন. ঠিক্ বলিতে পারি না, তবে তিনি বাহ্যিক কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না; আস্তে আস্তে খাটের উপর গিয়া বসিয়া পা দুখানি ছড়াইয়া দিলেন। বিনোদিনী অনেক টানাটানি করিয়া জুতা মোজা খুলিয়া দিল, এবং তাহার পর মেজেয় জায়গা করিয়া জলখাবার আনিল। রাধাকান্ত কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিলেন, এবং আহারান্তে বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আফিস-ঘরে প্রবেশ করতঃ পিটিশন্ রেজোল্যুশন্ প্রভৃতি বৃহত্তর দেশহিতকর কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

কিন্তু পর দিন যে ঘটনা ঘটিল তাহাতে রাধাকান্তকে কিঞ্চিৎ বিচলিত করিয়া তুলিল। ভোর হইতে না হইতে পাড়ার ছেলেরা চীৎকার আরম্ভ করিল, “ওরে, এটা ডাক্তারখানা, কম্পাউণ্ডিং রুমে প্রবেশ নিষেধ।” “ও

ডাক্তার বাবু, ঔষধ আছে ?" ইত্যাদি। রাধাকান্ত বাহিরে আসিয়া অতি ধীর গম্ভীরভাবে আজকালকার ছেলেদের নৈতিক অধঃপতন সম্বন্ধে লম্বাচওড়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে গোলমাল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় দেখিয়া শেষে ফুটবলের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন! তাহার পর পূর্ব্বদিনে যাহা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন—"প্রবেশ নিষেধ" লেখা কাগজটা লইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া নর্দ্দমায় ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু বিনোদিনী সহজে নিরস্ত হইবার পাত্রী নহে। রাধাকান্ত বাড়ীর বাহির হইবামাত্র ঠাকুরপোকে দিয়া একটা ঝাঁটা আঁকাইয়া তাহার নীচে "রোগের ঔষধ" এই কথাটা লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দিল।

কিন্তু তবুও বিনোদিনীকে সকলে খুব ভালবাসিত! তাহার ছেলেমানুষী, তাহার দুষ্টুমি লোকের মনকে আহত না করিয়া বরং মিষ্টভাবে আকর্ষণ করিত। মেজাজ্ ভাল থাকিলে বিনোদিনী সকলের ক্রীতদাসী! লোকের বিপদ আপদ অসুখ বিসুখ ক্রিয়াকর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই দেখা যাইত। কিন্তু সেই মেজাজ্ একবার বিগড়াইলে আর রক্ষা ছিল না, তখনি সে অন্যমূর্ত্তি ধরিত। এক সময়ে কোন প্রতিবেশিনী বিনোদিনীর চালচলনকে খৃষ্টানী ধরণের

বলায় বিনোদিনী কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে স্বামীর সেল্‌ফ্‌ হইতে একগাদা বই হাতে লইয়া মিশনরি শিক্ষয়িত্রীর অনুকরণে ছাতা মাথায় দিয়া বিদ্রূপকারিণীর নাকের সাম্‌নে দিয়া পাড়া ঘুরিয়া আসে! কিন্তু আবার কিছুদিন পরে তাহারই ছেলের অসুখে সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া প্রাণপণে সেবা করে!

রাধাকান্ত শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। সংসারে বুড়ি পিসিমা, একটি ভাই ও স্ত্রী ছাড়া আর কেহই ছিল না। পিসিমা বুকে করিয়া দুই ভাইকে মানুষ করেন। তবুও রাধাকান্তের উপর যেন তাঁহার স্নেহপক্ষপাতটা বরাবর বেশী বলিয়া বোধ হইত। দোষ দেখিলেও তিনি রাধাকান্তকে মুখ ফুটিয়া কথনো কিছু বলিতে পারিতেন না, পাছে সে মনে কষ্ট পায়। যখন যাহা বলিবার আবশ্যক হইত বিনোদিনীকে দিয়া বলাইতেন। বিনোদিনী নিঃসঙ্কোচে পিসিমার কথাগুলি নিজের মত করিয়া গুছাইয়া স্বামীকে বলিত।

রাধাকান্ত বি এ পর্য্যন্ত পড়িয়া দেশে আসিয়া স্বদেশোদ্ধার কার্য্যে ব্যাপৃত হন। ছোট ভাই শ্যামাকান্ত গ্রামের এণ্ট্রান্স্‌ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িত। রাধাকান্তের পৈতৃক জমিজমা হইতে মাসিক প্রায় ত্রিশ চল্লিশ টাকা আয় ছিল। কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলিত। এই আয়ের উপর যখন আবার

দেশহিতকর কার্য্যোপলক্ষে রাধাকান্তের হাত পড়িত, তখন সংসার চলা ভার হইয়া উঠিত। বিনোদিনী তখন চালটা ডালটা এটা ওটা চাহিয়া চিন্তিয়া ধারধোর করিয়া কোন রকমে হাঁড়ি চড়াইবার ব্যবস্থা করিত।

রাধাকান্ত দেখিত, একটি ঝিরঝিরে স্বচ্ছ আনন্দ-প্রবাহের মুখে দারিদ্র্য ও অশান্তির পাষাণভার চাপান হইয়াছে, তবুও তাহা একটুখানি ফাঁক একটুখানি ছিদ্র পাইলেই তরল কলহাস্যে আপনাকে বাহির করিয়া দেয়। একটুখানি ভালবাসা, আর একটু স্বচ্ছন্দতা দিতে পারিলে স্বভাবসুখী বিনোদিনীর কত না সুখ হইত! রাধাকান্ত সবই বুঝিত এবং তাহার ইচ্ছাও হইত, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার কারণ, এই দেশোদ্ধারের নেশা এক সর্ব্বনেশে নেশা। যাহার মাথায় চড়ে তাহাকে চোখে মুখে কিছুই দেখিতে দেয় না। শুধু নিজেকে ম্যাজিনি গ্যারিবল্ডি মনে হইয়া অহঙ্কারের পরিতৃপ্তি সাধন হয় এবং সামান্য কাজ করিয়া বোধ হয় যেন কত কি করিতেছি। মনে হয়, স্ত্রীপুত্র পরিবার টাকাকড়ি সমস্তই মায়ের পূজার বলিদানসামগ্রী। এই নেশার প্রধান একটি লক্ষণ যে, ইহা হঠাৎ একেবারে ছাড়িয়া যায়। তখন এমনি অবসাদ আইসে যে, মনে হয়, হায়, হায়, এতদিন কি

করিয়াছি! বৃথায় সময় হারাইয়াছি! ইহার অপেক্ষা কাজকর্ম্ম করিয়া টাকাকড়ি জমাইলে কত ভাল হইত!

রাধাকান্তেরও তাহাই হইল। একদিন অপরাহ্নে রাধাকান্ত বাড়ী ফিরিয়াই লেপ্ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। বিনোদিনী গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা গরম হইয়াছে। রাধাকান্ত সেদিন আর কিছু খাইল না। পরদিন কিন্তু জ্বর খুব বাড়িয়া গেল, এবং ক্রমে সেই জ্বর রেমিটেণ্ট দাঁড়াইল। রাধাকান্তের বন্ধু মিউনিসিপাল কমিশনার ডাক্তার হরচন্দ্র দুই দিন অমনি আসিয়া দেখিয়া গেলেন। কিন্তু তাহার পর ডাকিতে গেলে আজ যাইব, কাল যাইব, করিয়া আর আসিতেন না। শ্যামাকান্ত তাঁহার বাড়ী গিয়া দাদার অবস্থা বর্ণন করিয়া ব্যবস্থা লইয়া আসিত;—ঘরে পয়সা নাই, কি করিবে! রাধাকান্ত দেখিল, তাহার বন্ধুবর্গ, চেলাবৃন্দ, তাহার কার্য্যে উৎসাহদাতৃগণ কেহই আর আসে না,—কেবল একজন, যাহার প্রতি মুখ তুলিয়া কখনো চাহেন নি, কোন কার্য্যে যাহার পরামর্শগ্রহণ আবশ্যক মনে করেন নাই, এতদিন নিতান্ত দাসীর মত যাহার সহিত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, সেই অনাদৃত বিনোদিনীই দিবারাত্র শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অশ্রান্ত সেবায় আপনাকে ক্লিষ্ট করিতেছে। রাত্রিশেষে প্রদীপও ম্লান হইয়া নিবিয়া যাইত,

কিন্তু বিনোদিনীর চক্ষু আর বুজিত না। কখনো দুধ গরম করিতেছে, কখনো পাখা করিতেছে, কখনো মাথায় ওডি-কলোন্ দিতেছে—তাহার আর তিলমাত্র বিশ্রাম নাই। রাধাকান্ত বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া মুগ্ধনেত্রে এই শুশ্রূষাকারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। ইহার ভিতরে এত ছিল—জানি নাই দেখি নাই! রাধাকান্ত কখনো বিনোদিনীর কোলে মাথা রাখিত, কখনো জ্বরতপ্ত হাত দিয়া বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিত,—বলিতে চাহিত, "আমাকে ক্ষমা কর, আমি বুঝিতে পারি নাই!" কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না। এইরূপে একুশ দিন ভুগিয়া রাধাকান্তের জ্বর ছাড়িল।

রাধাকান্ত যেদিন ভাত খাইল, সেই দিন আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া মাদুরের উপর বসিল। সকলি যেন নূতন নূতন কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল। দেশোদ্ধারের নেশা গিয়া আর এক কি নেশায় যেন তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আম্রমুকুলের গন্ধে দোয়েলের কণ্ঠস্বরে তাহার চোখে জল আসিতে লাগিল। বিনোদিনী তাহার জন্য পান লইয়া আসিলে রাধাকান্ত তাহাকে টানিয়া কাছে বসাইয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর! না বুঝিয়া অনেক দোষ করিয়াছি!"—তাহার আর কথা বাহির হইল না, ঠোঁট

কাঁপিতে লাগিল,—ছোট ছেলের ন্যায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিনোদিনী বাহুলতাবেষ্টনে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কেন অমন কর! তুমি ত কিছু কর নাই!"

রাধাকান্ত কহিল, "আমি ইচ্ছা করিয়া কিছু করি নাই, আমাকে ভূতে করাইয়াছে। তুমি কিছু মনে করিও না।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি কিছু মনে করি নাই, তুমি চুপ্ কর।"

তখন রাধাকান্ত স্থির হইয়া আস্তে আস্তে বিনোদিনীকে কহিল, "দেখ বিনোদ, আমি ভাবিতেছিলাম কলিকাতায় মেডিক্যাল কালেজে ডাক্তারি পড়িব। তুমি কি বল?

বিনোদিনী কহিল, "তুমি একটু ভাল করিয়া সারিয়া ওঠ, তাহার পর যা' ভাল হয় করিও।"

ইহার একমাস পরে একদিন রাধাকান্ত পিসিমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া এবং বিনোদিনীকে গোপনে চুম্বন করিয়া ডাক্তারি শিখিতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল।

রাধাকান্ত একটা মেসে থাকিয়া মেডিক্যাল্ কালেজে খুব মনোযোগের সহিত পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। মাসে দু'একবার করিয়া দেশে আসিয়া সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইত। কিন্তু থার্ডইয়ারে যখন রাত্রের কাজ আরম্ভ হইল, তখন তাহাও দুর্ঘট হইয়া উঠিল। রাধাকান্ত বাড়ির চিঠি সর্ব্বদাই পাইতেন এবং নিজেও লিখিতেন, তাহাতেই মন অনেকটা সুস্থির থাকিত।

এদিকে বিনোদিনী ঘরের কাজকর্ম্মে পিসিমার সেবা-শুশ্রূষায় কোন রকমে দিন কাটাইত। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে তাহার কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত, ভাল লাগিত না। রাধাকান্ত যেদিন আপনার ভ্রম সংশোধন করিয়া বিনোদিনীর সহিত মিলনচেষ্টায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, সেই দিন হইতে রাধাকান্তের প্রতি বিনোদিনীর সুপ্ত প্রেম হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া অন্তরে দারুণ জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। তাহার আর সে কৌতুকপ্রিয়তা ছেলেমানুষী নাই। এখন সে আর পুকুরে সাঁতার কাটে না, ঘাটে বসিয়া ছিপ্ লইয়া মাছ ধরে না। একদিনের ঘটনায় যেন তাহার বয়স দশ বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। মন যে দিন নিতান্ত খারাপ থাকিত, সেদিন বিনোদিনী

ল্যাভেণ্ডার বকুলফুল প্রভৃতি সইয়েদের বাড়ি ঘুরিয়া আসিয়া আপনাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত।

পাঁচ বৎসর প্রাণপণ খাটিয়া রাধাকান্ত এম্ বি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হইল। যে দিন গেজেট্ বাহির হইল সেইদিনই রাধাকান্ত চিঠি লিখিয়া পিসিমাকে খবর দিল এবং কালই প্রাতে বাড়ি যাইতেছে জানাইল। গৃহে আনন্দকোলাহল উঠিল। পিসিমা ভ্রাতস্পুত্রের জন্য পুকুরের টাট্‌কা মাছ ধরাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বাজারে ভাল দই সন্দেশ ফরমাস্ দিবার জন্য বিন্দিকে পাঠাইলেন।

একটা ছেঁড়া ব্যাগ্ হাতে করিয়া মলিনবেশে রাধাকান্ত যখন বাড়ি আসিয়া পৌছিল, তাঁহাকে দেখিবার জন্য গ্রামসুদ্ধ লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। ডাক্তার হরচন্দ্র সর্ব্ব-প্রথম আসিয়া তাঁহাকে কন্‌গ্র্যাচুলেট্ করিলেন। স্কুলের ছেলেরা সেইদিনই মিটিং করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার আয়োজন করিতে লাগিল।

সকলে চলিয়া গেলে পিসিমা সিন্ধুক হইতে রাধাকান্তের জন্য ছোট ভায়ের সাফ্ কাপড় বাহির করিয়া দিলেন। রাধাকান্ত স্নান করিয়া আসিলে, তাড়াতাড়ি তাহার আহারের আয়োজন করিয়া খাইতে ডাকিলেন। রাধাকান্ত

খাইতে বসিলে, পিসিমা বলিলেন, রাধা, তুই বড় রোগা হয়ে গেছিস্। এখন আর কোথাও যাস্‌নে। এখানে কিছুদিন থেকে শরীরটা শুধ্‌রে নে, তারপর কাজ আরম্ভ করিস্।"

রাধাকান্ত কহিল, "না পিসিমা, তা' হবে না। আমাকে কালই যেতে হবে। কালেজেই চাক্‌রী নেব কি নিজে প্র্যাক্‌টিস্ ক'র্‌ব, সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে' যা' হয় একটা ঠিক্ করতে হবে।"—বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। বিনোদিনীও তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

আহারান্তে রাধাকান্ত শয়নগৃহে আসিয়া বিনোদিনীর অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। দেরী দেখিয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ঘড়ির কাঁটা যতই সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল, নীচে বাসনমার্জ্জনরতা বিনোদিনীর চুড়ির ঠুং ঠাং শব্দ যতই কাণে আসিতে লাগিল, তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল ঘড়িটা পা দিয়া চুরমার করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে, বাসনগুলা ছুঁড়িয়া পুকুরে ফেলিয়া দেয়! এমন সময়ে বিনোদিনী আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়াই সস্মিত মুখে কহিল, "তা' বই কি, কালই যাবে! তা' হচ্ছে না।"

রাধাকান্ত কহিল "না গেলে যে নয়।"

বিনোদিনী সদর্পে কহিল, "আমি কখনই যেতে দিব না!"

রাধাকান্ত মনে মনে চরিতার্থ হইয়া কহিল, "আচ্ছা সে কথা পরে হবে, এখন তুমি একটু ব'সো দেখি।"

বিনোদিনী বসিয়া রাধাকান্তের হাতখানা নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল, "সত্যি সত্যি তুমি বড় রোগা হইয়া গিয়াছ।"

রাধাকান্ত বলিল, "আমি বাঁচিয়া আছি এই ঢের। তবে শোন। যখন পড়িতে আরম্ভ করি, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বাঁচি আর মরি, যে রকম করিয়া পারি তোমাদের কষ্ট দূর করিতে হইবে। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পড়িতাম। নীচে কামারের দোকানে হাতুড়ি-পেটার শব্দ থামিয়া যাইত, দোকানদারেরা আলো নিবাইয়া দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইত, কুল্‌পিওয়ালা হাকিয়া হাকিয়া শ্রান্ত হইয়া রকের উপর শুইয়া পড়িত,—তখনো আমার পড়া চলিতেছে। শেষে ভোরের দিকে স্ক্যাভেঞ্জারের গাড়ীর আওয়াজ শুনিয়া বই বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িতাম। এই রকম করিয়া পরীক্ষার চারি মাস পূর্ব্বে ভারি ব্যায়রামে পড়িলাম। সে যে কি কষ্ট

"পাইয়াছি! রাত্রে চাকরকে ডাকিলে পাওয়া যাইত না, মেসের কর্ত্তা নাসিকাগর্জ্জনে নিদ্রা যাইতেন,—তৃষ্ণায় প্রাণ ফাটিয়া গেলেও জল পাইবার যো ছিল না। খোলা দুরজা দিয়া হুহু করিয়া বাদলার হাওয়া ঘরে ঢুকিত,—উঠিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিই সে ক্ষমতাটুকুও ছিল না। সে যাত্রা অনেক করিয়া রক্ষা পাইয়াছি। পাছে তুমি ভাবো তোমাকে কিছু জানাই নাই। অসুখের সময় কেবলি তোমার কথা, তোমার সেই শুশ্রূষার কথা মনে হইত। সত্যি বিনোদ, সে আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না!"

বিনোদিনী কহিল, "ও কথা বলিয়া কেন আমাকে লজ্জা দাও, আমি কিছু করি নাই।—তা' হ'লে তো তোমার ভারি কষ্ট গিয়াছে! যা'হোক্ ভগবান তোমাকে শেষ পুরস্কার দিয়াছেন।"

রাধাকান্ত বিনোদিনীর হাতের চুড়ী ঘুরাইতে ঘুরাইতে কহিল, "বিনোদ, আমি ভাবিতেছি, আমাদের জমিদার বাবুর কাছে বাড়ি ও জমিজমা বন্ধক রাখিয়া চারি পাঁচ হাজার টাকা ধার লইয়া কলিকাতায় গিয়া নিজেই প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করিয়া দিই। জমিদার বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে ত তোমার খুব ভাব। তোমার বকুলফুলকে একবার বলিয়া দেখ না।

বিনোদিনী কহিল, "ঠিক্ বলিয়াছ, আমি আজই বলিব।"

এই সময়ে পিসিমা ডাকিলেন, "ও বৌমা, বেলা হ'য়ে গেল, খাবে এস।"

বিনোদিনী তখনও স্নান করে নাই; উঠিয়া দৌড়িয়া স্নান করিতে গেল।

পরদিনই রাধাকান্ত জমিদার বাবুর কাছে কথাটা উত্থাপন করিলেন। বিনোদিনী তাহার সইকে আগেই বলিয়া রাখিয়াছিল। জমিদার বাবু সহজেই সম্মত হইলেন,—লেখাপড়া করিয়া রাধাকান্তকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিলেন।

সকলের ইচ্ছায় রাধাকান্ত একমাস বাড়িতে কাটাইল। এই একমাস দাম্পত্যপ্রেমের নিবিড়ানন্দময় মিলনে হুহুঃ শব্দে চলিয়া গেল। তাহার পর রাধাকান্ত টাকা লইয়া কালকাতায় প্র্যাক্‌টিস্ করিতে গমন করিল।

৩

রাধাকান্ত কলিকাতায় আসিয়া বড় রাস্তার ধারে একটা মাঝারি রকমের বাড়ী ভাড়া লইয়া সুসজ্জিত করিল। বাইরে সাইন্‌বোর্ড টাঙ্গাইল। নীচে রোগী দেখিবার ঘরে একটা মস্ত নরকঙ্কাল ঝুলাইল। চক্‌চকে

খানখান নূতন বই সব কিনিয়া সেলফে সাজাইল। আলমারিতে ডাক্তারি অস্ত্রশস্ত্র ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল। টেবিলের উপর ডাকিবার ঘণ্টা রহিল। যেখানে যাহা আবশ্যক সব ঠিক হইল। রাধাকান্ত অল্প দামে একটা গাড়ি ঘোড়াও কিনিল।

রাধাকান্তের নম্র স্বভাব, সদয় ভদ্র ব্যবহার, উপরন্তু সুন্দর মুখশ্রী সকলের নিকট তাঁহার পসার বাড়াইল। গরীব গৃহস্থ যে যাহা দিত রাধাকান্ত তাহাই লইতেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্র্যাক্‌টিস জমিয়া গেল।

একদিন বর্ষায় বিকালবেলা বৃষ্টি পড়িতেছিল। রাধাকান্ত রোগীর অপেক্ষায় নীচের ঘরে টেবিলের উপর পা ছড়াইয়া দিয়া "মেডিক্যাল্‌ জর্ণাল" পড়িতেছিলেন। এমন্ সময়, এক বেহারা আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি চিঠি দিল। রাধাকান্ত চিঠিটা খুলিয়া পড়িলেন, "আমার ছেলের ভারি অসুখ, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই চিঠি পাইয়াই আসিবেন।" নীচে নাম ছিল না, লেখাটা মেয়েলি ধরণের বলিয়া বোধ হইল। গাড়ি প্রস্তুত ছিল। রাধাকান্ত তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া গাড়িতে গিয়া উঠিলেন। বেহারা কোচ্‌বাক্সে উঠিল।

বৌবাজারে এক গলির ভিতর হল্‌দে রঙের বাড়ীর

সামনে গাড়ি গিয়া থামিল। বেহারা রাধাকান্তকে পথ দেখাইয়া তেতালার একটি ঘরে লইয়া গেল। রাধাকান্ত ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, এক যুবতী স্ত্রীলোক ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া খাটের উপর বসিয়া আছেন, পার্শ্বে তেরো কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের একটি বালক অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। রাধাকান্তকে দেখিয়া স্ত্রীলোকটি উঠিয়া খাটের কাছে একটা চৌকি আগাইয়া দিলেন। রাধাকান্ত বসিলে তিনি বলিলেন, "আমার এই ছেলেটি কাল হইতে এইরূপ হইয়া আছে, কিছুতেই চেতনা হইতেছে না।"

রাধাকান্ত ছেলেটির নাড়ী এবং অন্যান্য লক্ষণ ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহার কি পূর্ব্বে আর কখনো এই রকম হইয়াছিল?"

স্ত্রীলোকটি কহিলেন, "ইহার প্রায়ই মধ্যে মধ্যে এইরূপ হইয়া থাকে, কিন্তু কখনো এত বেশী সময় পর্য্যন্ত থাকে না—এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার সারিয়া ওঠে।"

"সর্ব্বপ্রথম যখন এইরূপ হয়, তখন কেন হয় বলিতে পারেন?"

"তাহা হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। আমার প্রগল্‌ভতা যদি মাপ করেন, তাহা হইলে সব কথা খুলিয়া বলি।"

"সব শোনা আবশ্যক।"

তখন স্ত্রীলোকটি বড় বড় চক্ষু দু'টি আনমিত করিয়া নখের প্রান্তভাগ খুঁটিতে খুঁটিতে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন,—"আমার স্বামী পশ্চিমে মীরাটে কমিসারিয়েটে কাজ করিতেন। কাজকর্ম্ম করিয়া তিনি অনেক সম্পত্তি করিয়াছিলেন। অধিকাংশই পশ্চিমে। আমি বিবাহের পর হইতে বরাবর তাঁহারই সঙ্গে ছিলাম। সংসারে আমার বাপ মা ভাই বোন মাসি পিসি কেহই ছিল না, শুধু এক পিসেমশায় ছিলেন। আমার বিবাহের টাকাকড়ি দানসামগ্রী লইয়া তাঁহার সহিত আমার স্বামীর বিষম ঝগড়া হয়, এমন কি, মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত ছিল না। আমার পিসতুত ভগ্নী আমার ছেলেবেলাকার একমাত্র সঙ্গী ছিল। সে যে কোথায়, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন খবর পাই নাই। যাক্, কি বলিতে কি বলিতেছি। একদিন আমার স্বামী আপিস হইতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া তামাক খাইতেছেন, হঠাৎ তাঁহার বুকে এমনি ব্যথা ধরিল যে, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। অনেক ডাক্তার দেখান হইল, তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। দুই দিন অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া আমার স্বামীর মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমার এই

ছেলেটি "যাই যাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সে যে বিপদ গিয়াছে,—কোন দিক্ সাম্‌লাই যে, তাহার ঠিক পাই নাই! মনে বল বাঁধিয়া কোন রকমে স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া ঘরে ফিরিয়া ছেলের শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। যখন ভাল রকম জ্ঞান হইল, ছেলেকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, 'আমি চৌকিতে বসিয়াছিলাম, দেখিলাম, বাবা আমাকে হাত নাড়িয়া 'আয় আয়' বলিয়া ডাকিয়া শূন্যে চলিয়া গেলেন। তাহার পর কি হইল জানি না।' সেই অবধি প্রায়ই ইহার মূর্চ্ছা হইত। ছেলেকে লইয়া আমি ব্যস্ত থাকিতাম, বিষয় সম্পত্তি সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ছেলেকে কলিকাতায় আনিয়া ভাল ডাক্তার দেখাইব স্থির করিয়া বিষয় সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। এই কাজ করিতে আমার প্রায় এক বৎসর লাগিল। আজ দুই মাস হইল এখানে আসিয়াছি। এখানে আসিয়া ত ছেলের এই অবস্থা!"—বিধবার গণ্ড বাহিয়া দুই ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

রাধাকান্ত অবিচলিত ভাব দেখাইয়া কহিল, "আপনি কিছু ভাবিবেন না, আপনার ছেলে শীঘ্র আরাম হইয়া যাবে। আপনি ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। এখন

যেরূপ বলিয়া দিই তাহাই করুন, পরে অন্য ব্যবস্থা করিব। এই বলিয়া রাধাকান্ত ঔষধপত্র সমস্ত ঠিক্ করিয়া দিয়া উঠিলেন।

স্ত্রীলোকটি অতি দীনভাবে কহিল, "আজ আর একবার আসিবেন না ?"

রাধাকান্ত বলিল, "আজ বোধ হয় আর আসিবার আবশ্যক হইবে না। দুই ঘণ্টা পরে কেমন থাকে একবার লোক পাঠাইয়া আমাকে খবর দিবেন। আসা আবশ্যক বিবেচনা করি আসিব।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

গাড়িতে উঠিয়া রাধাকান্তের মনে হইল যেন কোন্ মায়াজাল ছিঁড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পালাইবেন কোথায়! যে দিকে চাহেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন ঐ বিধবা তাঁহার পদতলে নতজানু হইয়া বলিতেছে, "ওগো ডাক্তার, আমাকে, আমার ছেলেকে রক্ষা কর—আমি নিরাশ্রয়, আমার কেহ নাই!" তখন রাধাকান্তের মনে হইতে লাগিল—বর্ষার বারিবর্ষণ যেন তাহারি আঁখিজল, বায়ুর সোঁ সোঁ শব্দ তাহারি দীর্ঘশ্বাস, মেঘের গর্জ্জন তাহারি আর্ত্তস্বর! কি এক করুণায় বেদনায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

গাড়ি হইতে নামিয়া কিছু না খাইয়া রাধাকান্ত শুইয়া পড়িল। একটু শব্দ শুনিলেই তাহার মনে হইতে লাগিল "ঐ বুঝি ডাকিতে আসিয়াছে!"

অশান্ত নিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া প্রত্যূষে রাধাকান্ত ছেলেকে দেখিতে গেলেন। গিয়া দেখিলেন, ছেলেটি উঠিয়া বসিয়া কথা কহিতেছে। মাতার মুখ প্রফুল্ল। রোগীর বিষয় জিজ্ঞাসাবার্ত্তা আপনার কর্ত্তব্য সারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলে, পূর্ব্বদিন এখান হইতে ফিরিবার সময় গাড়িতে রাধাকান্ত স্বপ্নবৎ যে কথাগুলি কাণে শুনিয়াছিল, বিধবা তাহাকে ঠিক্ সেই কথাগুলি বলিল,—"ডাক্তার বাবু, দয়া করিয়া মাঝে মাঝে আসিয়া আমাদের খোঁজ লইবেন, আমরা নিরাশ্রয়, আমাদের কেহ নাই।"

রাধাকান্ত কহিল, "সে কথা আপনাকে বলিতে হইবে না। আমি রোজ আসিয়া আপনাদের খবর লইব।"

রাধাকান্ত প্রত্যহই আসিতে লাগিলেন। যেদিন নিজে আসিতে পারিতেন না, লোক পাঠাইয়া খবর লইতেন। এইরূপে ক্রমে তিনি বিধবার একজন ঘরের লোকের মত হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং অভিভাবকস্বরূপ হইয়া টাকাকড়ি সংসারের সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ইহার প্রতিদানে বিধবা স্বহস্তে

কার্পেটের জুতা সেলাই করিয়া, কখনো বা মখমলের উপর সুন্দর রেশমী ফুল আঁকিয়া পোর্টফোলিওর মত করিয়া, নানারকমে উপহার দিত।

৪

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে কলিকাতায় প্লেগ খুব চাগিয়া উঠিল। দিবারাত্রি "হরিবোল" উত্থিত হইয়া কর্ণকে বধির করিয়া তুলিল। প্রত্যহ প্রায় দুই শত করিয়া লোক মরিতে লাগিল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মানুরাগী রাধাকান্ত প্রাণের মমতা ছাড়িয়া গলি ঘুঁজি বস্তি আবর্জ্জনাকুণ্ডের মাঝখানে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। প্লেগ্‌রোগীর জন্য কেহ ডাকিতে আসিলে তিনি বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ যাইতেন। প্লেগ্‌রোগীর চিকিৎসা তাঁহার সময়ের অধিকাংশ ভাগ অধিকার করিয়া লইল। উৎসাহের তীব্রতায় রাধাকান্ত অনেক সময়ে এই ভীষণ ব্যাধির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন আবশ্যক, তাহাও করিতেন না।

একদিন এক প্লেগ্‌রোগীকে দেখিয়া আসিয়া রাধাকান্তের জর হইল এবং দেখিতে দেখিতে গলা ফুলিয়া উঠিল। রাধাকান্ত মনে মনে বুঝিলেন এইবার আর

রক্ষা নাই। সহরের বড় বড় ডাক্তার খবর পাইয়া অমনি আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

বিধবা দুই তিন দিন রাধাকান্তের কোন খবর না পাইয়া ছেলেকে দেখিতে পাঠাইল। ছেলে ফিরিয়া গিয়া মাকে তাঁহার অসুখের সংবাদ দিল। বিধবা যেমন ছিল রাধাকান্তের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাধাকান্তের তখনো অল্প অল্প জ্ঞান আছে, কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই। চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ। কপালের শির দুটা ফুলিয়া উঠিয়াছে। রাধাকান্ত বুঝিল কে আসিয়াছে—দৃষ্টিতে ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে যতদূর সাধ্য বিধবাকে তাঁহার কাছে আসিতে নিষেধ করিল। বিধবা বুঝিল, বুঝিয়াও কিন্তু রহিল।

ডাক্তাররা তাহাকে বেতনভোগী ব্যবসায়ী সেবিকা ভাবিয়া, কি করিতে হইবে, কখন্ কি ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, সব ঠিক করিয়া বলিয়া দিল। দিবারাত্রি সে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় ডাক্তারের আজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

রাধাকান্ত ক্রমে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িল।

এদিকে বিনোদিনী স্বামীর কোন খবর না পাইয়া একদিন প্রাতঃকালে দেবরকে সঙ্গে লইয়া রাধাকান্তের

বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিবে এমন সময়ে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "একি! সুধা, তুই এখানে!"

সুধা বলিল, "দিদি, তুমি এখানে!"

বিনোদিনীর স্বামীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় সে কথার কোন উত্তর না দিয়া শিহরিয়া বলিল, "ও'র কি হইয়াছে!"—বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে গেল।

সুধার আর বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। সে দুই হাত দরজায় দিয়া বিনোদিনীর পথরোধ করিয়া কহিল, "লক্ষ্মী দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, ঘরে ঢুকিও না! আমি সব বলিতেছি। তুমি ঐ বারান্দায় গিয়া একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনই যাইতেছি।" এই বলিয়া জোর করিয়া বিনোদিনীকে বারাণ্ডায় পাঠাইয়া দিল।

সুধা সর্ব্বাঙ্গ ভাল করিয়া ধৌত করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বারান্দায় আসিলে দুইজনে গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিল। কাঁদিয়া মনের ভার যখন ঈষৎ লঘু হইল, সুধা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা পিসতুত ভগ্নী বিনোদিনীকে খুলিয়া বলিল।

বিনোদিনী কহিল, "অসুখের কথা আমাকে জানালি নি কেন?"

সুধা কহিল, "রাধাকান্ত বাবু যে তোমার স্বামী, তাহা ত জানিতাম না।"

বিনোদিনী কহিল, "বোন্, তুই আমার অধিকার কাড়িয়া লইয়াছিস্। যা' হইবার তা' হইয়াছে, এখন আমার কাজ আমাকে করিতে দে।"

সুধা বিনোদিনীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "দিদি, সে হবে না। আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি শেষ করিতে দাও। তুমি আর ইচ্ছা করিয়া এ বিপদে ঝাঁপ দিও না। উনি একটু ভাল হইতেছেন। আমি রোজ চিঠি লিখিয়া তোমাকে খবর দিব।" সে কাঁদিয়া কাটিয়া কোন মতে স্বামীর কাছে থাকিয়া তাহার শুশ্রূষা করিবার সঙ্কল্প হইতে বিনোদিনীকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতে না পারিয়া অবশেষে ডাক্তারকে দিয়া বলাইল যে, তাহাকে দেখিলে, কিম্বা যদি তাহার অবস্থিতির বিষয় ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে, তাহা হইলে রাধাকান্তের পক্ষে মঙ্গল হইবে না ;—মানসিক উত্তেজনায় রোগ বৃদ্ধি পাইয়া হঠাৎ আশঙ্কার কারণ ঘটিতে পারে।

তখন বিনোদিনী নিরুপায় হইয়া চৌকাট্ হইতে স্বামীকে একবার দেখিয়া ম্লানমুখে অপরিচিতার মত গাড়ীতে গিয়া উঠিল। গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ

দুইহাতে বেদনাবিদ্ধ বক্ষে আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল।

নগরীর জনতার মধ্য দিয়া এই হতভাগিনীকে টানিয়া লইয়া গাড়ি সশব্দে ষ্টেশন অভিমুখে চলিল।

৫

রাধাকান্ত ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম জ্ঞান হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যে স্ত্রীলোকটি আমার সেবা করিতেছিলেন তিনি কোথায়?"

চাকর বলিল, "আজ দুই দিন হইল তিনি বাড়ি চলিয়া গিয়াছেন।"

রাধাকান্ত সুস্থ হইয়া শরীরে একটু বল পাইয়াই বিধবার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দরজায় তালাবন্ধ। পাশের বাড়ি হইতে একটি লোক বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আজ সাত দিন হইল মা ছেলে দুইজনেই প্লেগে মারা গিয়াছে।"

আর একটিও কথা না কহিয়া রাধাকান্ত সেই মুহূর্তে কোচম্যান্‌কে গাড়ি ফিরাইতে বলিলেন। বাড়ি আসিয়া শুদ্ধমাত্র হাতবাক্সটি সঙ্গে লইয়া দ্বারে তালা-চাবি লাগাইয়া একেবারে পাগলের বেশে দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পিসিমা তাহার চেহারা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিনোদিনী খাটে আছড়াইয়া পড়িল।

রাধাকান্ত বেশ সারিয়া উঠিলে একদিন বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার অসুখে যে সেবা করিয়াছিল সে এখন কোথায়?"

রাধাকান্ত স্থির গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "সে আর নাই, স্বর্গে গিয়াছে।"

বিনোদিনীর মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল, কহিল, "কি বলিতেছ!"

রাধাকান্ত কহিল, "আমি ঠিক বলিতেছি। সে মারা গিয়াছে।"

বিনোদিনী বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "সে যে আমার মামাতো ভগ্নী। আহা, সে এইখানে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে বলিয়াছিল! কি হইল!"—বলিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাধাকান্ত নিজেই অভিভূত—কে কাহাকে সান্ত্বনা করে ঠিক নাই।

সোরাব ও রোস্তম

পারস্যের পূর্ব্ব প্রান্তে সিস্তান নামে একটি পার্ব্বত্য-প্রদেশ। বহুদূরব্যাপী মরুভূমি এই প্রদেশের চারিপাশ দিয়া চলিয়াছে। দূরে স্থানে স্থানে শুষ্কভূমি ভেদ করিয়া দুই একটি ক্ষুদ্র নদী মন্দস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। যে স্থান দিয়া নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই স্থানের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি যা' একটু উর্ব্বরা—শস্যক্ষেত্রে শোভিতা, নতুবা দিগন্তহারা বালুকার স্তর কেবল ধূধূ করিতেছে। গ্রীষ্মকালে এই প্রদেশে উত্তপ্ত বায়ু থাকিয়া থাকিয়া হুহু করিয়া বহিয়া যায়, যাহা সম্মুখে পায় তাহা উষ্ণনিশ্বাসে একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলে। মধ্যাহ্নে এই বায়ুর অগ্নি-স্পর্শ সহ্য করিতে না পারিয়া পশুপক্ষীগণ বালুকার ভিতর মুখ গুঁজিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া থাকে, অনেক সময়ে তাহাদিগকে মৃত বলিয়া ভ্রম হয়। মধ্যে মধ্যে দগ্ধ ধরণীর স্ফোটকের ন্যায় দুই একটি ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা যায়, সেই পাহাড়ের উপর হরিণশিশুরা খেলা করিয়া বেড়ায়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাদের বড়

এই গল্পের কিয়দংশ ম্যাথিউ আর্ণল্ডের কাব্য হইতে গৃহীত।

একটা দেখা যায় না। সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, প্রকৃতি দেবী এই প্রদেশ দিয়া অতি লঘু পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার শ্যামল চরণের চিহ্ন তেমন ফুটিতে পারে নাই। মধ্যাহ্নে গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকলে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, কোথাও সাড়া শব্দ শুনা যায় না। মনে হয় যেন কোন এক ভীমদর্শন নিষ্ঠুর দৈত্য সমস্ত প্রদেশটির বুকে চাপিয়া তাহার রক্ত শোষণ করিতেছে।

এইরূপ একদিন গ্রীষ্মকালে, একটি জলাভূমির প্রান্ত-বর্ত্তী নিভৃত গৃহে পারস্যের সর্ব্বপ্রধান বীর রোস্তম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বসিয়া আছেন। পারস্যরাজ কায়কাউস এককালে তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন, সমস্ত রাজ্যের ভার তাঁহার হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতায় পারস্যরাজের মনে এক্ষণে বিদ্বেষ ও আশঙ্কার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্য রোস্তম একটু ক্ষুণ্ণ, মর্ম্মব্যথিত। তিনি বসিয়া গম্ভীর ভাবে মনে মনে কি একটা স্থির করিতেছেন। পার্শ্বে সজল-নয়নে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্ত্রী তাহ্‌মিনা। অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে একটি কথা নাই, অবশেষে তাহ্‌মিনা অঞ্চল দিয়া নয়নের জল মুছিয়া

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "একটি মাত্র ভিক্ষা, তাহাও কি পূর্ণ করিবে না? আমি আর কিছু চাহি না, শুধু এই চাহি যে, আমার গর্ভে যে সন্তান আছে, সেই সন্তান যদি পুত্র হইয়া জন্মলাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে শৈশবে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইও না—মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে রণক্ষেত্রে লইয়া যাইও না।"

বলিতে বলিতে তাহ্‌মিনার চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া আসিল, বসনে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

রোস্তম মাটির দিকে মুখ করিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে তাহ্‌মিনাকে পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "রমণী তোমরা কি কেবল আমাদের কর্ত্তব্য পথের বিঘ্ন? চিরকালই কি কেবল আমাদিগকে শৃঙ্খলের মত বাঁধিয়া রাখিবে? পুরুষের শত সহস্র কর্ত্তব্য আছে; গৃহ, পরিবার, সেই কর্ত্তব্যের আনন্দ-অবসর বিশ্রামভূমি মাত্র। কন্যা হইলে তাহার জন্য পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া সযত্নে ঢাকিয়া রাখিও, কিন্তু পুত্রের জন্য কণ্টকশয্যা চাহি, কর্ম্মক্ষেত্র চাহি। অষ্ট বর্ষ পরে আমি আবার ফিরিয়া আসিব। তোমার যদি পুত্রসন্তান হয়, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া আবার কর্ম্মক্ষেত্রে যাইব। আর দেখিও, আমি চলিয়া গেলে তোমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে যেন সমধিক যত্ন করিও।"

রোস্তম এই কথাগুলি একটু দৃঢ়স্বরে রুক্ষভাবে বলিলেন। রোস্তমের হৃদয় যে সম্পূর্ণ অবিচলিত ছিল তাহা নহে, তবে বীর হইয়া, পুরুষ হইয়া স্ত্রীর নিকটেও হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ করিতে তিনি একটু কুণ্ঠিত, লজ্জিতও বটে। হৃদয়ের প্রকৃত ভাব গোপন করিতে গিয়া আমরা ছদ্মভাবকে প্রায়ই অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াইয়া তুলি।

তাহ্‌মিনা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অভিমানভরে কহিতে লাগিলেন,—"তোমাদের প্রবৃত্তি তোমাদিগকে যে দিকে টানিয়া লইয়া যায় সেই তোমাদের কর্ত্তব্যপথ, আর তোমরা আমাদিগকে গলায় রজ্জু দিয়া যে দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে আমাদের কর্ত্তব্য-পথ সেই দিকে। তা' যদি সেই বন্ধনে প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া আসে তবু একটি কথা কহিবার যো নাই, তাহা হইলে তোমাদের কর্ত্তব্য-পথে বাধা পড়ে!"

অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিলে অন্তঃপুররক্ষক আসিয়া সংবাদ দিল যে, প্রস্থানের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, অশ্ব সজ্জিত হইয়া দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।

রোস্তম উঠিলেন। স্বীয় বাহু হইতে স্বনামখোদিত একটি কবচ খুলিয়া তাহ্‌মিনার হাতে দিয়া বলিলেন, "পুত্র হইলে তাহার দক্ষিণ বাহুতে এই কবচটি বাঁধিয়া দিও।"

এই বলিয়া রোস্তম দ্বারদেশে গিয়া রুকশ্ নামক অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

(বিংশতি বর্ষ পরে)

২

তাতার প্রদেশের মধ্য দিয়া অক্ষস নদী সবেগে প্রবাহিত। সফেণ স্রোত রৌদ্রালোকে ঝিক্ ঝিক্ করিয়া ছুরির মত সশব্দে যেন তীর কাটিয়া চলিয়াছে। বিদেশী পথিক দূর হইতে এই জলের শব্দ শুনিয়া অনেক সময়ে থমকিয়া দাঁড়ায়, কাণ পাতিয়া কিসের শব্দ ঠিক করিয়া আবার ধীরে ধীরে চলিয়া যায়। তীরে এখানে সেখানে গোমেষাদির কঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত-শিখর হইতে তুষার গলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত নানাদিক হইতে এই নদীতে আসিয়া পড়ে। তখন নদীর কূলে কূলে জল, জলে তীর ভাসিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি গোমেষও ভাসিতে থাকে,—জল সরিয়া গেলে কেবল কঙ্কালগুলি তীরে পড়িয়া থাকে। স্থানে স্থানে শতপাকে জড়াইয়া দুই একটি শুষ্ক লোণা লতাবৃক্ষ মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া আছে, ইহা ভিন্ন কোথাও গাছপালা বড় একটা দেখা যায় না।

তরঙ্গায়িত বেলাভূমির উপর তাতারবাসী ও পারসীক উভয় পক্ষের শিবির—বালুকাময় ভূমিখণ্ড ব্যবধান। সারি সারি ছোট ছোট লাল রঙের তাম্বু পড়িয়াছে, মধ্যাহ্ন-কিরণে সেইগুলি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। একদিকে বড বড় শিরস্ত্রাণ পরিয়া শ্রেণীবদ্ধ পারসীক অশ্বসৈন্য পশ্চাতে অসংখ্য পদাতিক গায়ে গায়ে মিশিয়া কেহ তীর ধনুক লইয়া, কেহ তলোয়ার লইয়া, কেহ বল্লম হস্তে, কেহ বা শরপরিপূর্ণ তূণীর হস্তে দণ্ডায়মান। অন্যদিকে সহস্র সহস্র তুরাণী সৈন্য মেষচর্ম্মে মস্তক আবৃত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। শিবিরের বাহিরে নানা রঙের পতকা উড়িতেছে। মাথার উপর শকুনি ভাসিতেছে। যুদ্ধ আরম্ভের আর বিলম্ব নাই।

দ্বিপ্রহর অতীত হইলে তুরী ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, অস্ত্রের ঝঞ্চন্ শব্দ আরম্ভ হইল, অশ্বের হ্রেষারব ও খুরধ্বনি শুনা গেল। শৃঙ্খলাবদ্ধ হিংস্র জন্তুর ন্যায় সৈন্যেরা রণে ঝাঁপ দিবার জন্য উন্মুখ।

এমন সময়ে তুরাণী সৈন্যদিগের মধ্য দিয়া যুবক বীর সোরাব বালুকার উপরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সোরাবের কটীতে তরবারি, দক্ষিণ হস্তে বল্লম, বামহস্তে একটি ফলক। চারিদিক একবার উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া সোরাব

বলিলেন, "সৈন্যগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। পারসীক-দিগের মধ্যে যদি এমন কোন বীর থাকেন, যিনি আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে সক্ষম—আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সোরাবের এই গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া বীর রোস্তম পারসীক সৈন্যদিগকে ঠেলিয়া, তাঁহার সেই দীর্ঘ আয়ত দেহ লইয়া সোরাবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন! রোস্তমকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে দেখিয়া পারসীক সৈন্যদিগের মধ্যে আনন্দপ্রবাহ বহিতে লাগিল। রোস্তম দেখিলেন অল্প দূরে তাঁহার সম্মুখে, কোমলতনু অথচ তেজস্বী এক যুবক উপেক্ষাভরে লতিকার ন্যায় ঈষৎ হেলিয়া দণ্ডায়মান। রোস্তম একদৃষ্টে, স্নেহ পূর্ণ নয়নে যুবকের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার কিশোর সুন্দর মুখ দেখিয়া তাঁহার অন্তরে বাৎসল্য জাগিয়া উঠিল। রোস্তম হাত তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "বৎস! যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হও। আমার পুত্র নাই, তুমি আমার পুত্র হইয়া মৃত্যুকাল পর্যান্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক!"

প্রভাতের সমীরণস্পর্শে পত্রোপরি শিশিরবিন্দু যেরূপ টলমল করিয়া উঠে, রোস্তমের কথা শুনিয়া সোরাবের অন্তরে সেইরূপ অস্পষ্ট একটা ভাব কম্পিত হইয়া উঠিল।

তিনি রোস্তমের পদতলে নতজানু হইয়া, রোস্তমের দুই হাত বজ্রমুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন, "বল, সত্য করিয়া বল, তুমি কে? তুমি কি রোস্তম?"

রোস্তম ভাবিলেন যে, তাঁহার নাম শুনিলে, নানা ছল বাহির করিয়া সোরাব আর যুদ্ধ করিবে না। পরাজয় স্বীকার না করিয়া তাতারে ফিরিয়া গিয়া সকলের নিকটে সাহঙ্কারে বলিবে—"আমি পারসিক বীরদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করি। ভয়ে কেহই অগ্রসর হইল না, কেবল রোস্তম যুদ্ধে সম্মত হইলেন। অবশেষে পরস্পরে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া যুদ্ধ আর হইল না।" এই ভাবিয়া রোস্তম সজোরে হাত টানিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেলেন। সোরাবের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন, "আমি রোস্তম কি কে তাহা জানিয়া তোমার লাভ কি? তুমি কি কেবল রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহ! রোস্তম এখানে থাকিলে তোমাকে আর যুদ্ধ করিতে হইত না, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তুমি ভয়ে পলায়ন করিতে! উদ্ধত যুবক! তুমি রোস্তমের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহ—তোমার এতস্পর্দ্ধা!"

রোস্তমের কথায় রাগে সোরাবের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া

উঠিল। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "এস তবে যুদ্ধ আরম্ভ কর।"

রোস্তম কোনও উত্তর দিলেন না। তাঁহার বৃহৎ বল্লম তুলিয়া ধরিয়া সোরাবকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্যুৎবেগে নিক্ষেপ করিলেন। সোরাব ত্রস্ত মৃগের ন্যায় লাফাইয়া ঈষৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন। বল্লম সোরাবের গায়ে লাগিল না, হিস্ হিস্ শব্দে পাশ কাটিয়া বালুকার উপর গিয়া পড়িল। সোরাব তাঁহার বল্লম নিক্ষেপ করিলেন। রোস্তমের ফলকের উপর ঝনাৎ করিয়া লাগিয়া বল্লমের মুখ ভাঙ্গিয়া গেল।

নিষ্ফলপ্রয়াস হইয়া রোস্তম সক্রোধে সোরাবের উদ্দেশে তাঁহার ভীষণ গদা নিক্ষেপ করিলেন। সোরাব পূর্ব্বের ন্যায় চকিতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, গদা বালুকার ভিতর প্রোথিত হইয়া রহিল, এবং রোস্তম সেই ভারক্ষেপের বেগে টলিয়া পড়িলেন। সোরাব ইচ্ছা করিলেই সেই মুহূর্ত্তে রোস্তমকে ছিন্নশির করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করিলেন না। রোস্তমের কাছে আসিয়া স্কন্ধে হাত দিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "উঠ, আমার উপর রাগ করিও না। তোমাকে দেখিলে আমার রাগ দ্বেষ কিছুই থাকে না—তুমি আমাকে এমনই বিকল

করিয়াছ! আমি বালক সত্য বটে, কিন্তু আমিও অনেক যুদ্ধ দেখিয়াছি—ছিন্নবাহু ছিন্নপদ আহতদিগের কাতর ক্রন্দন অনেক শুনিয়াছি, কখনও আমার পাষাণহৃদয় এইরূপ বিচলিত হয় নাই। সত্য কি তুমি রোস্তম নও?"

সোরাবের কথা শেষ না হইতে রোস্তম উঠিয়া ভূমি হইতে তাঁহার ধূলি-মলিন বল্লম তুলিয়া আনিলেন। প্রদীপ্ত অঙ্গারের ন্যায় তাঁহার নেত্র জ্বলিতে লাগিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া তিনি বলিলেন, "বালক! সাদর সম্ভাষণে তুমি আমাকে ভুলাইতে চাহ!" এই বলিয়া রোস্তম বল্লম তুলিয়া ধরিলেন। সোরাবও খাপ্ হইতে তরবারি খুলিলেন, সূর্য্যালোকে ঝক্‌মক করিয়া উঠিল। তৎপরে আঘাতের পর আঘাত উভয়ের অঙ্গে বর্ষিত হইতে লাগিল। রোস্তম বল্লম দ্বারা সোরাবের বর্ম্মে আঘাত করিলেন, বর্ম্মের খানিকটা ভিন্ন হইয়া গেল। সোরাব তরবারি দ্বারা রোস্তমের শিরস্ত্রাণে আঘাত করিলেন, শিরস্ত্রাণ খসিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। ভীমকান্তির উপর কোমল শুভ্রতা অর্পণ করিয়া রোস্তমের ধবল কেশ দেখা দিল—রোস্তম লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। রোস্তমের আসন্ন বিপদ দেখিয়া রুক্‌শ্ এই সময়ে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—সেই শব্দে নদীর জল কাঁপিতে লাগিল।

মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিল; জলে কালো ছায়া পড়িল, কিন্তু যুদ্ধ তবুও থামিল না। রোস্তম অনেকক্ষণ কিছুই বলিলেন না, কেবল আপন মনে গুমরিতে থাকিলেন। পরে দেহের সমস্ত রুদ্ধ শক্তির বেগে "রোস্তম" বলিয়া বজ্রধ্বনিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। এই নাম শুনিয়া সোরাব রোস্তমের মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তকাল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া গেলেন। হাত হইতে ফলক পড়িয়া গেল। অবসর দেখিয়া রোস্তম শাণিত অস্ত্র সোরাবের বক্ষে বিদ্ধ করিলেন। সোরাব বক্ষবিদ্ধ অসি বাম হস্তে ধরিয়া বালুকার উপর পড়িয়া গেলেন।

সোরাবকে পতিত দেখিয়া রোস্তম উপেক্ষাভরে কহিলেন, "তুমি আপন দোষে প্রাণ হারাইলে।"

সোরাব নির্ভীকচিত্তে কহিলেন, "বৃথা অহঙ্কার করিও না। তুমি আমাকে মার নাই, রোস্তম আমাকে মারিয়াছেন! তোমার মত বিংশতি বীরকে আমি একাকী ভূমিশায়ী করিতে পারি। কিন্তু তোমার মুখনিঃসৃত ঐ রোস্তমের নাম আমার বলবীর্য্য সব কাড়িয়া লইল, আর তুমি সুবিধা পাইয়া চোরের মত আসিয়া আমাকে মারিলে! শীঘ্রই ইহার প্রতিফল পাইবে। রোস্তম

যখন তাঁহার সন্তানের মৃত্যুর কথা শুনিবেন, তখন দীপ্ত-শিরা হইয়া পুত্রঘাতক তোমাকে ইহার উচিত শাস্তি দিবেন।"

পদতলে সন্তান পড়িয়া রহিয়াছে, রোস্তম তাহা জানিতে পারিলেন না। সোরাবের কথায় বিশ্বাস না করিয়া তিনি বলিলেন, "নির্ব্বোধ! কেন বৃথা প্রলাপ বকিতেছ! রোস্তমের পুত্র হয় নাই, শুধু একটি মাত্র কন্যা আছে।"

সোরাবের বাক্‌শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সুতীব্র বেদনা সমস্ত শরীরে কম্পনাকারে ব্যক্ত হইতেছে। তথাপি ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি মিথ্যা বলি নাই; রোস্তমের পুত্র আছে—সেই পুত্র আমি। বিংশতি বর্ষের মধ্যে একদিনের জন্যও আমি পিতার মুখ দেখি নাই। মাতাকে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নীরব হইয়া থাকিতেন। শেষে আর না থাকিতে পারিয়া আমি পিতার অন্বেষণে বাহির হইলাম। ভাবিয়াছিলাম তাতার-বাসীদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পারসীক বীরদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলে রোস্তমকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না। মনে করিয়া দেখ, যখন রোস্তম তাঁহার একটি মাত্র পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে জানিবেন তখন তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিবে!

পিতার কথা ততটা ভাবি না—আমার মাতা আমাকে না দেখিয়া কিরূপে বাঁচিবেন! বিদায় লইবার সময় মাতা কতবার অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিয়াছিলেন—'বৎস, শীঘ্র যুদ্ধ হইতে ফিরিও—বিলম্ব করিও না।' আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আর তাঁহার সহিত দেখা হইল না।" এই বলিয়া সোরাব বালকের ন্যায় উচ্চস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

রোস্তমের এখনও বিশ্বাস হইল না যে, সোরাবই তাঁহার পুত্র। পুত্র হইয়াছে শুনিলে রোস্তম শৈশবে তাঁহাকে কাড়িয়া লইবেন এই ভয়ে তাহ্‌মিনা রোস্তমকে তাঁহার কন্যা হইয়াছে এই মিথ্যা সংবাদ দেন। সেই অবধি রোস্তমের বিশ্বাস যে, তাঁহার পুত্র হয় নাই কন্যা হইয়াছে। তবুও সোরাবের কথা শুনিয়া যৌবনের স্মৃতি বিজড়িত অনেক কথা মনে পড়িয়া রোস্তমের চক্ষে জল আসিল। তিনি দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "তোমার মত পুত্র পাইলে রোস্তমের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু তুমি ভুল বলিতেছ, রোস্তমের পুত্র হয় নাই।"

এক হস্তের উপর ভর দিয়া, অল্প একটু উঠিয়া সোরাব ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "বিশ্বাস করিতেছ না! যতদিন বাঁচিয়াছিলাম মিথ্যা হইতে দূরে ছিলাম—এখন মরিতে

আসিয়া কি মিথ্যা বলিব! আমি রোস্তমের পুত্র কি না প্রমাণ দেখিতে চাহ?'' এই বলিয়া সোরাব দক্ষিণ বাহুতে রোস্তমের নাম খোদিত কবচ দেখাইয়া কহিলেন—"রোস্তম এই কবচ মাতাকে দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে, পুত্র হইলে তাহার দক্ষিণ হস্তে এই কবচ বাঁধিয়া দিও।"

কবচ দেখিয়া রোস্তমের শরীর কাঁপিতে লাগিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। শেষে উর্দ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বৎস, তুমি মিথ্যা বল নাই। আমিই রোস্তম তোমার পিতা! পিতার হস্তে তোমার মৃত্যু হইল!" স্বীয় বক্ষে বিদ্ধ করিবার জন্য রোস্তম তরবারি বাহির করিলেন।

সোরাব অতি কষ্টে সরিয়া রোস্তমকে জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "পিতা, আমি নিজের দোষে প্রাণ হারাইয়াছি, তোমার কোন দোষ নাই। কেন মিথ্যা শোক করিতেছ?" এই বলিয়া রোস্তমের হাত হইতে তরবারি লইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রোস্তম তরবারি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সোরাবকে বুকের মধ্যে লইয়া তাহাকে বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রুকৃশ্ আসিয়া, সোরাবের মুখের কাছে মুখ আনিয়া কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। রোস্তম

তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "রুক্শ্, এখন তুমি দুঃখ করিতেছ, কিন্তু তুমিই ত বহন করিয়া আমাকে রণক্ষেত্রে আনিয়াছ !"

রুক্শের নাম শুনিয়া সোরাব তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই রুক্শ্ ? আমি ইহার কথা মাতার নিকট শুনিয়াছিলাম। এই বলিয়া রুক্শের মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সোরাব আবার বলিলেন, "পিতা আমার মৃতদেহ সিস্তানে লইয়া যাইও, আমার সমাধি প্রস্তরের উপর লিখিয়া রাখিও— ব'র রোস্তমের পুত্র সোরাব এইখানে শয়ন করিয়া আছে। পিতা না জানিয়া পুত্রকে বধ করেন।" এই বলিয়া সোরাব বক্ষ হইতে অসি টানিয়া বাহির করিলেন। রক্ত ঝরিতে লাগিল। সোরাব রোস্তমের ক্রোড়ে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, আর নড়িলেন না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। একে একে শিবিরের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। রোস্তম একাকী সোরাবের মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া নদীতীরে বালুকার উপরে পড়িয়া রহিলেন।

জুতার কথা

আমার বংশ পরিচয় অনাবশ্যক। তোমরা সকলেই আমাকে জান। রাস্তার যত ময়লামাটি ধুলা কাদার সহিত আমার সম্পর্ক; তোমরা আমাকে দূরে ঘরের বাহিরে রাখিয়া তবে ঘরে প্রবেশ কর; তোমরা কাহাকেও যদি সর্ব্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত অপমানিত করিতে চাহ ত আমাকে তাহার অঙ্গে স্পর্শ করাও;—প্রত্যহ আমাকে পদদলিত করিয়া, পাষাণে কঙ্করে কণ্টকে আমার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোমাদের যত সুখ। থাক্ সে কথা।

সূতিকাগারে জাতকর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া কত্তন সীবন প্রভৃতি নানারূপ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যখন আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলাম, তখন দেখি এক চীনেম্যান সাহেবের দোকানে আমি আলমারীবদ্ধ। সেখানে আমার জাতিগোষ্ঠি আত্মীয়স্বজন অনেককেই আমারই দশাপ্রাপ্ত দেখিলাম।

শুনিয়াছি তোমাদের বেণ্টিঙ্কষ্ট্রীট্ নামে কি একটা নামজাদা বড় রাস্তা আছে—তার দুই ধারে বড় বড়

দোকানে আমার স্বজাতিবর্গ অনেকেই আরামে বাস করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বজন্মের অনেক পাপের ফলে তোমাদের হ্যারিসন রোড ও চিৎপুর রোড যেখানে মিশিয়াছে—সেই চৌমাথার কাছে অন্ধকার ভাঙ্গা স্যাঁতসেতে ছোট্ট একটি কুট্‌রীতে আমার থাকিবার স্থান ছিল। ঘরের দক্ষিণে একটা সরু গলি ছিল; সেই গলির একপার্শ্বে একটা নর্দ্দমা। আমাদের গায়ের গন্ধের কথাত ত্রিভুবন-খ্যাত, কিন্তু এই নর্দ্দামার দুর্গন্ধে এহেন আমারও পেটের ভাত উঠিয়া আসিত। ঘরের উত্তরে একটা ময়রার দোকান ছিল। রজতশুভ্র পূর্ণ-শশধরের ন্যায় তোমাদের ঐ কি বলে "লুচি" ও কাঞ্চন কুণ্ডলশ্রী "জিলাপি" নামক আর একটা পদার্থ হাতে করিয়া যখন ফুটপাথের উপর দিয়া লোক যাতায়াত করিত, তখন ক্ষুধিত আমার নাড়িশুদ্ধ জ্বলিয়া উঠিত। হায়! তোমাদের মধ্যে এমন্ সুরসিকও আছে!—ঠোঙা হাতে করিয়া কেহ কেহ ঠিক্ দোকানটির সাম্‌নে ফুটপাথের উপর ত্রিভঙ্গ মুরারির মত দাঁড়াইয়া, আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া চক্ষু বুজিয়া পরমানন্দে ঠোঙাভ্যন্তরস্থ রসময় পদার্থগুলি এক একটি করিয়া রসনায় নিক্ষেপ করিত। তখন আমার ইচ্ছা

হইত চিলের মত ছোঁ মারিয়া ঠোঙাশুদ্ধ তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া আসি। সহরে আর কি কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান ছিল না!

রুদ্ধগৃহে অন্ধকারে আলমারীর দু'একটি ছিদ্রপথ দিয়া কোনমতে শ্বাস-প্রশ্বাস বজায় রাখিয়া সারারাত্রি আমি একরকম অচেতন ভাবে পড়িয়া থাকিতাম। প্রাতে চীনেম্যান সাহেব আসিয়া যখন দরজা খুলিতেন যেন অল্পে অল্পে সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিতাম, সাহেব নীল পায়জামা হাটুর উপর পর্য্যন্ত তুলিয়া আরাম কেদারায় ঠেস্ দিয়া অহিফেনধূমপানে স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছেন। প্রায় ঘণ্টাকাল সুখভোগের পর এদিক ওদিক একটু ঝাড পোঁচ করিয়া সীবনচন্দ্র প্রভৃতি লইয়া আমাদের বংশ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইতেন। তখন তোমা-দের একটির একটিকে দোকানে আসিয়া ইংরাজি বাঙ্গালা হিন্দির শ্রাদ্ধবাসরীয় অপূর্ব্ব ভাষায় ও সাঙ্কেতিক নানা প্রণালীতে চীনে সাহেবের সহিত রসালাপে নিযুক্ত দেখিতাম। আলাপান্তে তোমাদের পূর্ব্ব-পুরুষ যেরূপ সূর্য্যদেবকে বগলদাবাই করিয়াছিলেন, সেইরূপ কেহ যদি আমাদের কাহাকেও বগলদাবাই করিয়া লইয়া যাইতে না পারিতেন—তাহার পশ্চাতে অলক্ষে

প্রভু আমার যে সকল বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেন সে কথায় আর কাজ নাই। রামচন্দ্রের কৃপায় অহল্যার শাপমুক্তির ন্যায় তোমাদের অনুগ্রহে আমাদের একটির পর একটি আলমারীমুক্ত হইতে লাগিল দেখিলাম, কিন্তু আমার এই মুক্তিলাভে প্রায় ছয় বৎসরকাল বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তোমাদের মধ্যে যেমন "বামন" নামে এক শ্রেণীর লোক আছে, আমিও "এনোচ"! সেইরূপ ছিলাম। আমার বয়স বাড়িতে লাগিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার আকারের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিল না—সেই শৈশবকালের মত ছোট্ট বেঁটে এতটুকুই রহিয়া গেলাম।

তখন শরৎকাল। পূজার আর দুই একদিন বাকী আছে। দরজার ফাঁক দিয়া যতটুকু দেখা যায় দেখি, আকাশের রঙ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে; সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে গৃহ-ছাদ অতিক্রম করিয়া একটা বকুল-গাছের মাথা খানিকটা দেখা যাইতেছে—তাহার ঘন চিক্কন পল্লবের উপর রৌদ্র পড়িয়া হাসিতেছে; সানাইয়ের সুর বাতাসে ভাসিয়া হাসিতেছে; পথযাত্রী সৌখীন বাবুদের উড়ানি রুমালের সুগন্ধ দোকান

গৃহেও প্রবেশ করিতেছে,—লোক জন ব্যস্ত, আনা গোনা বেচা কেনার আর অন্ত নাই।

অপরাহ্ণে একটি বাবু ট্রাম হইতে নামিয়া আমাদের দোকান ঘরে প্রবেশ করিলেন। দোকানের এদিক ওদিক ঘুরিয়া আমার কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ আমাকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বাবুটির কেমন আমাকে পছন্দ হইল। আমার মুখ দেখার যৌতুক স্বরূপ দুইটি রজতমুদ্রা চীনে সাহেবের হাতে দিয়া বাবু আস্তে আস্তে দোকান হইতে বাহির হইলেন।

সে কি আরাম—কি আর বলিব! মুক্ত বায়ুস্পর্শে স্বাধীনতার হিল্লোলে আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল।

গ্রেষ্ট্রীটের মোড়ে একটা বাড়ির কাছে বাবুটি ট্রাম হইতে নামিলেন। বাড়িটির সর্ব্বাঙ্গে যেন পূজার পুলকানন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। দরজার কাছে শুভ্র যুথিকার ন্যায় ছয় বৎসরের একটি ফুট্‌ফুটে বালিকা দাঁড়াইয়াছিল। সে হাততালি দিয়া লাফাইতে লাফাইতে "বাবা আমার জুতা এনেছে" "বাবা আমার জুতা এনেছে" বলিয়া বাবুটির কাছে গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। তাহার পর আমাকে পায়ে দিয়া বালিকার আনন্দ

স্থির ধরে না—ছুটিয়া ছুটিয়া যাহাকে দেখিতে পায় বলে, "আমার নূতন জুতো—দেখ কেমন আমার নূতন জুতো, বাবা কিনে এনেছে! "বালিকার সুকোমল চরণস্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া গেল। তোমরা কমলের সহিত কেন চরণের উপমা দাও যেন বুঝিতে পারিলাম।

সমস্তক্ষণ বালিকা আমাকে পায়ে করিয়া রাখিল—আমাকে পায়ে দিযাই আহারে বসিল—কাহারও নিষেধ মানিল না। আহারান্তে আমাকে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া একটা কাঠের বাক্সর উপর ভাল করিয়া গুছাইয়া রাখিয়া দিল। তাহার পর সতৃষ্ণনয়নে বারবার আমার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া সে শয়ন করিতে গেল।

সেদিন সপ্তমীপূজা। মধ্যাহ্নে দেবীর পূজা ভোগ আরতি সব শেষ হইয়া গিয়াছে। কাঁসর ঘণ্টার রব থামিয়া গিয়াছে। পূজার আর্দ্র ফুলগুলি মাটিতে পড়িয়া আছে। ধূপ-ধূনার শেষ সুরভিশ্বাস অল্প অল্প নির্গত হইতেছে। পূজার দালান জনশূন্য—কেবল দু'একটি বাহিরের স্ত্রীলোক তখনও আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিয়া যাইতেছে।

এই অবকাশে ক্ষুদ্র বলিকা আমাকে পায়ে দিয়া দালানের উপর গিয়া পূজার ফুল কুড়াইতে লাগিল।

আঁচল ভরিয়া ফুল লইয়া হাসিতে হাসিতে যখন ফিরিয়া আসিতেছে, তখন তাহার পিতা সেই বাবুটির চক্ষে সে পড়িল। বাবু তখন পানোন্মত্ত—চক্ষু দু'টা জবা ফুলের মত লাল হইয়াছে, কণ্ঠ বিজড়িত, মেজাজটাও সপ্তমে চড়িয়া আছে। বাবু ছুটিয়া আসিয়া "লক্ষ্মীছাড়া পাজী মেয়ে! দালানে তুই জুতো পায়ে দিয়ে আসিস্!" বলিয়া বালিকার অঙ্গে সজোরে দুই লাথি বসাইয়া দিলেন। তাহার পর তাহার পা হইতে আমাকে টানিয়া খুলিয়া দূরে উঠানের এক কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। বালিকা একটুও কাঁদিল না—সে কেবল তাহার বড় বড় চোখ দু'টি তুলিয়া পিতার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পিতা চলিয়া গেলে বালিকা তাড়াতাড়ি আমাকে কুড়াইয়া লইয়া কাপড়ের মধ্যে করিয়া উপরের ঘরে আলমারীর নীচে লুকাইয়া রাখিল। সেদিন বালিকাকে কেহ আর ঘরের বাহির হইতে দেখিল না।

রজনী দ্বিপ্রহরে উৎসবান্তে যখন সকলে নিদ্রিত, বাবু অন্তঃপুরে শয়নগৃহে আসিয়া ডাকিতে লাগিলেন, "নিস্তারিনী! নিস্তারিনী! ঘুমিয়েছ?"

"একি! এত রাত্রে এখনও ঘুমোওনি যে?"

"না। খুকী কোথায়? কেমন আছে?"

"তার জ্বর হয়েছে।"

"জ্বর!"

"হাঁ—গাটা যেন আগুনপানা হয়েছে, চম্‌কে চম্‌কে উঠছে।"

"ওগো শুনছ। আমি আজ একটা বড় খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। খুকী আজ পূজোর দালানে জুতো পায়ে দিয়ে উঠেছিল ব'লে আমি ওকে খুব মেরেছিলুম। তাই, মা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ভৎসনা করে বললেন, "ভণ্ড! পাষণ্ড! তুই ঐ তোর নোংরা শরীর মন নিয়ে আমার পূজোর দালানে উঠতে পারিস, আর ঐ নির্দ্দোষ নিষ্পাপ নির্ম্মল বালিকা জুতো পায়ে আমার ঘরে গিয়েছিল ব'লে তুই তাকে এমন ক'রে মারলি! আমি ওকে আর তোদের এই পাপ সংসারে রাখচিনে—জুতো শুদ্ধ ওকে আমি আমার বুকের কাছে টেনে নেব।"

"ওমা কি হবে! কি বলচ।"

"হাঁ নিস্তারিনী, ঠিক বলচি। আজ বিকেল থেকে আমি একটুও মদ ছুঁইনি।"

"মদের খেয়ালে কি দেখতে কি দেখেচ—ও কথা বোলো না! বোলো না। যাও ঘুমাওগে।"

বাবু তখন খুকীর কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়া উঠিলেন, খুকীর বুকের কাছে ওর হাতে এ কি!"

স্ত্রী কহিলেন, "মেয়েটা কোন মতেই ছাড়বে না— জুতো হাতে নিয়ে তবে ঘুমোবে।"

বাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ঘাড় নাড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন, "ভাল লাগচে না, ভাল লাগচে না! ওগো ভাল লাগছে না!"

সারারাত্রি আমি খুকীর তপ্ত বক্ষের মধ্যে থাকিয়া কেবলই শুনিতে লাগিলাম, "ভাল লাগচে না! ভাল লাগচে না!"

পরদিন পূজার আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। ডাক্তারের পর ডাক্তার আসিয়া যখন শঙ্কাকুল গম্ভীর-মুখে ফিরিয়া যাইতে লাগিল, তখন অন্তর না বলিলেও সকলই বুঝিতে পারিয়া দেবীর চরণে লুটাইয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "ক্ষমা কর! মা, আমায় ক্ষমা কর! আমাকে যে শাস্তি দিতে চাও দাও, কেবল আমার সর্ব্বস্ব ধন খুকীকে কেড়ে নিও না মা, কেড়ে নিও না!"

সারারাত্রি সারাদিন খুকীর শিয়র প্রান্তে বসিয়া পিতা

মা প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিল, কিন্তু সকলই ব্যর্থ হইল। শেষ অবধি খুকী আমাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিল। মাঝে মাঝে প্রলাপে সে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল "বাবা, আমার জুতো! বাবা, আমার জুতো কই!"

দুইদিন কাটিয়া গেল। বিজয়ার সানাইয়ের করুণ-সুরের মধ্যে যখন চিরবিচ্ছেদের বেদনা বাজিতে লাগিল—দেবীর বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সেই দিন আর একটি জীবনও বিসর্জ্জিত হইল।

এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আজও শোকাকুল জননী প্রত্যহ দিনের মধ্যে কতবার আলমারী খুলিয়া আমাকে বাহির করিয়া বুকের উপর প্রাণপণে চাপিয়া ধরেন—নয়ন জলে আমার সর্ব্বাঙ্গের ধূলা ধৌত করিয়া দেন।

আজও আমি আলমারী বদ্ধ, কিন্তু আজ আমি মুক্ত,—বালিকার আমরণ ধ্যান, জগন্মাতার ক্রোড়ে শয়ান, মার বুকের ধন!

সন্তোষিণীর ডায়ারি

১লা বৈশাখ, রাত্রি ১০টা।

খুকী কাল জ্বরে সারারাত ছট্‌ফট্‌ করেচে। ভোরের দিকে পাখা কর্‌তে কর্‌তে আমার একটু তন্দ্রা এসেছে—এমন সময় পায়ের শব্দে আমি চম্‌কিয়ে উঠ্‌লুম্‌। দেখি, খুকীর বাবা খাটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। অসংযত বেশ, নেশায় ভরপূর। খুকী তাঁর মুখের দিকে খানিকক্ষণ ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে' তাকিয়ে থেকে বল্‌ল, "বাবা তুমি কোথায় ছিলে?"—উনি কোন কথা না বলে' খুকীর কপালে একবার হাত দিয়ে বাইরের দিকে আবার ফিরে চল্‌লেন। আমি আর থাক্‌তে পারলুম না, উঠে, পা জড়িয়ে ধরে' মিনতি করে' বল্‌লুম, "অন্য সময়ে যা' কর, এ সময়ে আর এমন অবহেলা কোরো না। বাড়ী থেকে, একটা ভাল ব্যবস্থা কর;—ব্রজেন্দ্র ডাক্তারকে একবার ডাক্‌তে পাঠাও।"

ওঁকে শপথ করিয়ে নিয়ে খুকীর কাছে এসে আবার বস্‌লুম। বসবামাত্র খুকী আমার গলা জড়িয়ে ধরে' উপরো-উপরি চুমো খেতে লাগ্‌ল। বুঝ্‌তে পারলুম,

বাবার কাছে পাওনা আদায় করতে না পেরে, মেয়েটা আমার কাছ থেকে স্থদে আসলে পুষিয়ে নিতে চায়। আমি তাকে যথেষ্ট আদর করে' তার ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। আমার মন কিন্তু বলতে লাগল,—"বাছা, তুই শুধু আমাকেই জানিস, আমাকেই আঁকড়ে ধরে' আছিস, কিন্তু ওরে আমি কে, আমি কি জানি, আমি কি করতে পারি!—আমার এই বুকভরা স্নেহ, আমার প্রতিদিনের শত সহস্র শুভকামনা, আমার দেহ প্রাণ সর্বস্ব দিয়ে আমি তোর জীবনের কতটুকু সার্থকতা সম্পাদন করতে পারি!—নারে, যিনি জগদম্বা, যিনি আমার মা, যিনি তোর মা, যিনি কীট পতঙ্গ সকলের মা,—তোর উপর যাঁর করুণা আশীষে আমার স্তনে দুগ্ধ, হৃদয়ে অতল ভালবাসা, তোর এই দুর্লভ মানবজন্ম,—তাঁকেই চিনে থাক্, তাঁকেই আঁকড়ে ধর্!" খুকীর দু'খানি কচি হাত আমার মুঠোর ভিতর নিয়ে তাঁকে প্রাণ ভরে' ডাকতে লাগলুম। এমন সময়ে শুনতে পেলুম্ বাইরে গলির ধারে ভিখিরী গান গাচ্চে,—

যদি রাখিতে হয়, রেখো মা,
ঐ চরণতলে;

সংসারের শত পাকে
মন যেন পড়ে থাকে
ঐ চরণতলে ;
যদি থাকিতে হয় সংসারে
সুখদুখমাঝে,
মাগো, সুখে যেন বুঝি
তুমি দাও তাই পুঁজি,
তোমা হতে সবি ;
আর নয়নের জলে
সদা যেন প্রতিফলে
তব মুখ ছবি।

দুপুরবেলায় ডাক্তার এসে খুকীকে দেখে গেলেন। দুই তিন দাগ ওষুধ খাবার পর খুকী একটু ভাল বোধ করতে লাগল, ঘাম দিয়ে জ্বরটা কমল।

বেলা তিনটের সময় তরকারী বানাচ্চি এমন্ সময় মা এসে আমার কাছে বস্‌লেন। একথা সে কথার পর বল্‌লেন, "বৌমা, ওকে একটু দেখো, তুমি একটু শক্ত না হ'লে আর উপায় দেখ্‌চিনে"—ইত্যাদি। আমি চুপ্ করে শুনে গেলুম। মা প্রায়ই এইরূপ বলে থাকেন। আমি কি করব! উপায় দেখ্‌তে আমি কি আর বাকী রেখেচি!

জন্মমৃগের ন্যায় সব রকম উপায় হাতড়ে দেখেছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। আমার হৃদয়ের ক্রন্দন, মান অভিমান, কাকুতি মিনতি সমস্তই অরণ্যের পল্লবমর্ম্মরের ন্যায় নিষ্ফল শূন্যে মিশে গেছে। মা বলেন আমাকে শক্ত হ'তে, কিন্তু পৃথিবীতে শক্ত হ'য়ে কে কবে কাকে ফেরাতে পেরেছে!—মন যখন লতার মত মোহ-তরুকে সহস্র নাগপাশে বেষ্টন করে' থাকে, তখন তাহাকে ছাড়ান জোর কিম্বা টানাটানির কাজ নয়,—খুব সন্তর্পণে অতি ধীর মৃদুস্পর্শে তার গ্রন্থি শিথিল কর্‌তে হবে। বেশ বুঝেচি, যজ্ঞেশ্বর যিনি প্রতিদিনের এই বৃহৎ যজ্ঞে কাহারও পাতে মিষ্টরস কাহারও বা পাতে তিক্তরস পথ্যস্বরূপ দিচ্চেন, তাঁকে ডাকা ছাড়া এ মোহের হাত থেকে রক্ষা পাবার এবং রক্ষা কর্‌বার আর উপায় নেই। আমার মানস-সভায় যখন তাঁকে একমাত্র অধীশ্বর করে বসাতে পারব তখন তাঁরই করুণায় সব অমঙ্গল জয় করতে পারব।

এতদিন ঘর থেকে বেরোতে পারি নি। আজ সন্ধ্যের সময় চুল বেঁধে কাপড় ছেড়ে দক্ষিণের বারান্দায় এসে একটু বস্‌লুম। দেখি বেল জুঁই ফুলে বাগান ভরে' গেছে। তাদের নিশ্বাসসৌরভে চারিদিক আকুল করে' তুলেচে। আমি উপভোগ কর্‌তে কর্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম,

ভাগ্যিস ভগবান আমাদের মনকে ফুলের মত এইরকম কোমল করে' গড়েছিলেন, নইলে পুরুষজাতির এবং সেই সঙ্গে সমস্ত সংসারের কি দশা হ'ত! পুরুষরা ভাবেন, আমাদের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করে' জোর করে' কাজ আদায় করে নিচ্চেন। কিন্তু আমরা যে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত এই খাঁচার ভিতর ঝাট দিয়ে, উনুন ধরিয়ে, বাটনা বেঁটে রান্না করে মরছি, একি সমাজের অনুশাসনে, না পুরুষের কটাক্ষভয়ে, না কর্ত্তব্যবুদ্ধির তাড়নায়? কোনটার জন্যই নয়। এ কেবল ঐ ফুলের সৌরভের মত স্বতঃ উৎসারিত ভালবাসার দরুণ। নইলে ইচ্ছে করলে আমরা সংসারকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিতে পারি।

ঘরে এসে দেখি খুকীর জ্বর একেবারে ছেড়ে গেছে।

২রা বৈশাখ, রাত্রি ৯টা।

সকালে মায়ের চিঠি পেলুম। খুকীর অসুখের কথা শুনে তার জন্যে একটা মাদুলি পাঠিয়েছেন। নীচে রান্না-ঘরে নেমে এসে দেখি জেলেনী একরাশ মাছ নিয়ে আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আমাকে দেখে উঠে, প্রণাম করে, মাছগুলো আমার পায়ের কাছে ঢেলে দিলে। আমরা বিনি পয়সায় প্রায়ই এই রকম ভাল ভাল মাছ পেয়ে থাকি।

এ ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!—এই জেলেনীর কাছ থেকে আমরা বরাবর মাছ কিনতুম। একদিন ভোরে বারান্দায় বসে' মুখ ধুচ্চি এমন্ সময় এ এসে আমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে' বল্‌লে, "কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার মা ছিলে। আমি তোমাদের কাছ থেকে আর পয়সা নেব না, যখন যা, মাছ দরকার হবে অম্‌নি দেব।"—সেই অবধি ক্রিয়াকর্ম্মে পর্ব্বে যখন তখন এ আমাদের অম্‌নি মাছ যোগাচ্চে;—চাকরকে বাজারে দেখ্‌তে পেলে অম্‌নি তার থলির মধ্যে মাছ ফেলে দিয়া যায়।

আমি ভাবি, এই অশিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়েমানুষ, যে দুই মুটো অন্নের জন্য রোদে পুড়ে' জলে ভিজে মর্‌চে, সে কিসের বলে এতটা স্বার্থত্যাগ ক্ষতি স্বীকার করে? একি কেবল একটা অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারমাত্র—মরুভূমির মরীচিকা শুধু স্বপ্নই? না সত্যসত্যই ছায়া-লোকমণ্ডিত কোন সুদূর অতীত লোকের সম্বন্ধবিজড়িত সুখস্মৃতির জাগরণ? সে যাই হোক্, এটা বেশ দেখ্‌চি, ছোটলোকদের মধ্যে যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস, একনিষ্ঠ পারিবা-বারিক বন্ধন, শিক্ষাভিমানী আমাদের মধ্যে তাহা নেই। ভুলই হৌক ভ্রান্তিই হোক্, এরা যা, বিশ্বাস করে তদনু-

সারে কাজ করে, সহস্র ত্যাগ স্বীকার করে। মাসে ম্যে দশ টাকা উপায় করে সে কষ্টেসৃষ্টে সঞ্চয় করে' ঘরে কিছু পাঠায়, দেবসেবা তীর্থদর্শন প্রভৃতিতে কিছু ব্যয় করে। আমাদের না আছে ধর্ম্ম, না আছে কর্ম্ম। আমরা শুধু উপরে উপরে ভেসে বেড়াচ্চি। আমাদের আর সে আগেকার মত গার্হস্থ্য সুখ নেই। তখন অশন বসন ভূষণ সকল বিষয়েরই নিজের অবস্থা এবং আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য ছিল, এবং মনে সন্তোষও ছিল। এখন বাহিরের চাক্‌চিক্য বজায় রাখ্‌তে গিয়ে আমরা দর্জ্জি প্রভৃতির বিলের জ্বালায় ঋণগ্রস্ত ব্যতিব্যস্ত অস্থির হ'য়ে পড়্‌চি। আমরা এ কূল ও কূল দু'কূল হারাতে বসেচি। সত্যি বল্‌চি, আমার মেয়ে যদি গৃহধর্ম্ম পালন না করে, অথচ বি-এ কিম্বা এম-এ তে ফার্ষ্ট হয়, তাতে আমার মনে সুখ হয় না, কিন্তু সে যদি কোন পাশ না করে' ধর্ম্মে কর্ম্মে বিশ্বাসে সেবাশুশ্রূষায় ঘরকন্নায় আপনার ক্ষুদ্র সংসারকে মহিমান্বিত করে' তুল্‌তে পারে তা' হ'লে আমার আর সুখের অবধি থাকে না।

দাসদাসী সকলকে খুব পেট ভরে' মাছ খাওয়ান গেল। গরীব লোকদের নিজ হাতে করে' খাইয়ে যেমন সুখ, এমন আর কিছুতে হয় না।

দুপুর বেলায় আজ ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। উঠে দেখি চার্টে বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি তরকারী বানাতে গেলুম।

আজ অনেক দিনের পর আলমারীর মাথা থেকে আমার সেই পুরোণো বেহালাটা পাড়লুম। স্কুল ছেড়ে অবধি একে আর ছুঁইনি। তারগুলো ঠিক্ করে' বাজাতে গিয়ে দেখি আর বাজে না! অনেক কষ্টে যে টুকু সুর বা'র করতে পারলুম, তা' যেন কেঁদে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আর কেন আমাকে! যখন তুমি স্কুলের ছাত্রী একলা ছিলে, তখন তুমি আমাকে যত্ন করতে, আমিও তোমাকে মিষ্টিস্বরে সুখী করতুম্। তারপর সংসারী হ'য়ে অবধি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করেচ। এখন আবার আমার কান মুচ্‌ড়িয়ে বিরক্ত করা কেন!"

বেহালা বাজাতে বাজাতে আমার সেই স্কুলে বোর্ডিংএ থাকার কথা মনে পড়্‌ল। রাস্তার ধারে ঘর, তিন সহচরীতে একসঙ্গে থাক্‌তুম। তিন জনের তিনটি পালঙ্ক, তিনটি লেখবার ডেস্ক্। ছোট ছোট তিনটী বাক্স। প্রত্যূষে মুখ হাত ধুয়ে স্বহস্তে শয্যা তুল্‌তুম। বাগানে একটু বেড়িয়ে এসে একসঙ্গে পড়্‌তে বস্‌তুম।

স্নান আহার করে’ দশটার ঘণ্টা দিলে স্কুলে যেতুম। সেখানে অদৃষ্টে কোনদিন ভৎর্সনা, কোনদিন বা মিষ্ট সম্ভাষণ। বিকেলে বকুলতলায় দোল্‌নায় ‍ঝুল্‌তুম, ব্যাড্‌মিণ্টন্‌ খেল্‌তুম। সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত দশটা অবধি কোন রকমে নিদ্রা সম্বরণ করে’ ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে পাঠ অভ্যাস কর্‌তুম। তারপর পালঙ্কে শিথিল তনু এলিয়ে দিয়ে গভীর নিদ্রা। তখন কে জান্‌ত সংসার-সাগরে এরকম হাবুডুবু খেতে হবে!

৩রা বৈশাখ, রাত্রি ৯টা।

সকালে উঠে দেখি ছোক্‌রা বাবুলাল বারান্দার রেলিং ধরে’ দাঁড়িয়ে আছে। এর বাপ আমার স্বামীর বন্ধু-বাড়ি কাজ করে। জিজ্ঞাসা করে’ জান্‌তে পার্‌লুম—বাপের উপর রাগ করে’ পালিয়ে এসেচে,—কাল থেকে কিছু খায়নি। কিছু খেতে দিলুম। খেতে খেতে অভিমানভরে বল্‌তে লাগ্‌ল, “আমি মরে’ গেলেও আর বাপের কাছে যাব না, এইখানেই থাক্‌ব।” আমি তথাস্তু বলে তাকে তখনকার মত শান্ত কর্‌লুম।

ঠাকুরপোর কাছে শুন্‌লুম সুরোর নাকি আবার বিয়ে হচ্চে। শুনে কি যে আনন্দ হ’ল বল্‌তে পারিনে।

আহা মেয়েটার বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি দেখলে প্রাণ ফেটে যায়। বাপমায়ের কি কষ্ট! সুরোর বাবা প্রায়ই বলে থাকে, "এর চেয়ে মেয়েটা মরে গেলে ভাল হত, আর কষ্ট দেখা যায় না!" মায়ের ত চোখের জল এখন পর্য্যন্ত শুকোয় নি। সাত বৎসর বয়সে খুব ঘটা করে' বিয়ে হ'ল, কিন্তু হায়, এক পক্ষ অতীত হ'তে না হ'তে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর আক্রমণে সিঁথির সিঁদুর হাতের নোয়া খসে' পড়ল,—ঘরে হাহাকার উঠ্‌ল। সুরো তখন অতটা বুঝ্‌তে পারেনি, কিন্তু এখন অন্তরের ক্ষুধার সঙ্গে সঙ্গে জান্‌তে পেরেছে যে, তার কপাল ভেঙ্গেছে। তাই সে সর্ব্বদাই কেমন বিষণ্ণ মুহ্যমান।

ইহার কি কোন প্রতিকার নাই! আমি মানি, যে সতী মৃত পতির চরণে সমস্ত অর্পণ করে' সংসারের সহস্র কর্ত্তব্যের মাঝে তাঁকে নিত্য স্মরণ করেন, এবং লোকান্তরে তাঁর সঙ্গে মিলনের আশায় কঠোর জীবন-ধারণ করেন, তিনি সমাজের পূজ্যা, রমণীর শিক্ষার স্থল। কিন্তু যে স্বামী কি বুঝ্‌ল না, চোখে ভাল করে দেখ্‌ল না, সামাজিক কোন্ যন্ত্র পেষণ করে' তার অন্তর থেকে পতিপ্রেমরস বা'র কর্‌তে পারে তা'ত জানিনে!

সন্ধ্যে হ'তে না হ'তে বাবুলাল বাড়ি যাবার জন্যে

ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। আমার কাছে এসে বল্‌লে, "বাবা আমাকে না দেখতে পেয়ে হয় ত খুঁজে বেড়াচ্চে, আমি বাড়ি চল্‌লুম।" তখন তার রাগ একেবারে পড়ে গেছে দেখ্‌লুম।

সেও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে আমি বারান্দায় এসে দেখি সত্যি সত্যি তার বুড়ো বাপ গলির ধারে ছেলের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন আমার মনে হ'ল, হায়, আমরা কত সময়ে বৃথা অভিমানে স্ফীত হ'য়ে ভগবানের উপর অবিশ্বাস করে, তাকে ভুলে, তাঁকে ছেড়ে, চল্‌তে চাই, মনে করি, আপনার বলে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে' সারাপথ এই রকম চল্‌তে পার্‌ব;—কিন্তু শেষে দুর্দ্দিন যখন রজনীর অন্ধকারের ন্যায় পক্ষ বিস্তার করে' আমাদের গ্রাস কর্‌তে আসে, যখন ফের্‌বার জন্যে মন একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠে, তখন ফিরে' দেখি, ঐ বৃদ্ধের ন্যায় ভগবান আমাদের ফিরিয়ে নেবার জন্য দুই হস্ত প্রসারণ করে' দাঁড়িয়ে আছেন।

৪ঠা বৈশাখ, রাত্রি ১১টা।

খুব ভোর থাকতে উঠে বারান্দায় এসে বস্‌লুম। তখনও ভাল করে আলো ফোটে নি। দু'একটা পাখীর

পাখার ঝাপ্‌টা ও অস্ফুট কলধ্বনি মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। ফুলের মৃদুগন্ধ স্নিগ্ধ বাতাসে ভেসে আস্‌চে। সহরটা তখন সবে গা ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌বার উদ্যোগ কর্‌চে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভিখিরীরা হাতে টুক্‌নী নিয়ে একে একে আস্‌তে লাগ্‌ল। অন্ধবুড়ি, প্রকাণ্ড গোদ হিন্দুস্থানী, ধবলরোগিণী পোড়া, চলৎশক্তিহীন খঞ্জ;—এই রকম বিচিত্র বিকৃত দৃশ্য। ঠাকুরপোর কাছ থেকে চাল নিয়ে সকলে আস্তে আস্তে ফিরে গেল।

প্রত্যূষের এই মুষ্টিদান প্রাতঃস্নানের ন্যায় মনে কেমন্‌ একটা আরাম শান্তি তৃপ্তি আনে,—সমস্ত দিনের জন্যে যেন মনের সুর বেঁধে দেয়। গৃহস্থের স্বজনকে অতিথিকে দাসদাসী সকলকে প্রতিমুহূর্ত্তে দিতে হবে তারই এ মঙ্গল সূচনা।

য়ুরোপীয়দের চক্ষে এরকম ভিক্ষাদান হয় ত ততটা প্রীতিকর নয়। তাদের গরীব দুঃখী রোগীদের জন্য বড় বড় হাঁসপাতাল আশ্রম কর্ম্মালয় কত কি আছে। এই সবের জন্যে এক এক জন কত লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কর্‌চে এবং অসংখ্য লোক খাট্‌চে। কিন্তু হাজার টাকা থাক্‌লেও যেমন দাসদাসী অপেক্ষা নিজের হাতে সন্তান পালন করে

সুখ এবং স্বস্তি, পাচক অপেক্ষা নিজের হাতে রন্ধন ও পরিবেশন করে আনন্দ এবং তৃপ্তি, তেমনি আমদের প্রাত্যহিক জীবনে এই রকম ছোটখাট স্বহস্তদানে কল্যাণ এবং পরিতোষ আছে।

দুপুর বেলায় কোথেকে হঠাৎ বাতাস উঠে দরজায় দমাদম ঘা দিয়ে গাছের মাথা ঝাঁকিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছোটখাট একটা সাইক্লোনের সৃষ্টি করলে। সঙ্গে সঙ্গে খুব বৃষ্টি ও শিলাবর্ষণ আরম্ভ হ'ল। কাকেরা কা কা চীৎকার করতে লাগল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে একসঙ্গে জটলা হয়ে রুদ্ধগৃহের সার্সি দিয়ে বাইরে প্রকৃতির এই প্রলয়-মূর্ত্তি দেখতে লাগলুম। মনে হতে লাগল—বাতাস একটু জোরে বইলে, মাটি একটুখানি নড়ে উঠলে আমাদের আর রক্ষে নেই, তবুও কত দেমাক!

ঝড়ে বাসাসুদ্ধ দুটো শালিক পাখীর ছানা মাটিতে পড়ে গেল। ধাড়ি পাখিটা অস্থির হয়ে ছানাদের চারপাশে কেবলি উড়োউড়ি করতে লাগল। কি করবে যে ঠিক করতে পারচে না। চাকরকে দিয়ে ছানা দুটোকে যথা-স্থানে রাখিয়ে দিলুম—তবে সে ঠাণ্ডা হল।

সন্ধ্যের সময় ঝড় বৃষ্টি থেমে গেল। নববধূ যেন এতক্ষণ কাহার সহিত তুমুল কলহে প্রবৃত্ত ছিল, হঠাৎ

গুরুজনকে দেখে ঘোমটা দিয়ে সংযত হয়ে সরে দাড়াল। আকাশে চাঁদ উঠেছে, তারা চিক্‌চিক্ ক'র্‌চে। সত্যি, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করে' আশ মেটে না—ইচ্ছে করে রসগোল্লার মত সমস্তটা মুখে পুরে দিয়ে চিবিয়ে গিলে খাই।

ঠাকুরপো এইমাত্র শাসিয়ে গেল—আমার ডায়ারি এক্‌দিন চুরি করে ছাপিয়ে দেবে! এইখানেই আপাততঃ শেষ করা যাক্।

খ্রীষ্টানের আত্ম-কথা

শৈশবেই মাতৃহীন হই, এবং পাঠ্যাবস্থায় (যখন বি-এ ক্লাসে পড়ি) পিতাও আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যান।

আমি পিতার একমাত্র সন্তান। তিনি পঞ্চাশ টাকা বেতনে কলিকাতায় স্কুলমাষ্টারি করিতেন। কষ্টে সংসার চলিত। পিতা আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার অবস্থায় বার টাকা মাহিনা দিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়ান এই স্নেহের একটি নিদর্শন। কালেজের বেতন দিয়া ও অন্যান্য খরচ বাদে আমাদের উদ্বৃত্ত প্রায় কিছুই থাকিত না। মৃত্যুকালে পিতা একখানি পৈতৃক বাড়ী ছাড়া আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা এই বাড়ীতেই থাকিতাম।

সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়াতে অগত্যা আমার লেখা পড়া বন্ধ হইল। বলিতে ভুলিয়াছি, অল্পবয়সেই পিতা আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। আমার স্ত্রীর নাম প্রাণদা।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমরা দুইটি প্রাণী যখন সংসার সাগরে ভাসিতেছি, আমার এক দূর সম্পর্কীয় মামা স্নেহ-পরবশ হইয়া আজিমগড় এঞ্জিনিয়ার আফিসে কুড়ি টাকা

বেতনে আমার একটি কর্ম্ম করিয়া দিলেন। মামা সেই আফিসেই একটা বড় কাজ করিতেন।

অনেক চেষ্টায় আমাদের বসতবাড়ীর একটি ভাড়াটিয়া ঠিক করিয়া সস্ত্রীক আজিমগড যাত্রা করিলাম। আমি জীবনে এই প্রথম কলিকাতা ছাড়ি।

বেলা দশটার সময় আজিমগড়ে পঁহুছিলাম। মামা আমাদের জন্য একটি ছোটখাট বাংলা ঠিক করিয়াছিলেন। থাকিবার দুইটি ঘর ও দাওয়ায় দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা একটি ছোট রান্নাঘর ছিল। বাড়ীর পশ্চিম ধারে একটু বাগানের মত—দুই চারিটি গোলাপ ও চামেলি, এবং ফলের মধ্যে আতা ও পেয়ারা গাছ। এক মাইল ধরিয়া আর কোথাও ঘরবাড়ী নাই—সুবিস্তীর্ণ মাঠ ধূ ধূ করিতেছে।

ট্রেনে সারা রাত আমার ঘুম হয় নাই। বাড়ীতে পঁহুছিয়াই একটা মাদুর পাতিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে আমার স্ত্রী ঐন্দ্রজালিক ক্ষিপ্র হস্তচালনায় নিমেষের মধ্যে সমস্ত জিনিষপত্র সব গুছাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর চুলায় আগুণ ধরাইয়া এক বাটি গরম দুধ আনিয়া আমাকে খাইতে দিলেন।

এইখানে আমার স্ত্রীর একটু বর্ণনা করিলে আশা করি

কেহ আমাকে বেয়াদব ঠাওরাইবেন না। কারণ, এই আখ্যায়িকায় আমার স্ত্রীকে বাদ দিলে আমাকেও কলম বন্ধ করিতে হয়।

তবে নির্ভয়ে আরম্ভ করি! আমার স্ত্রী অসামান্যা সুন্দরী, অন্ততঃ আমার চক্ষে। এণাক্ষী, শুকচঞ্চুনাসা, বিম্বোষ্ঠ প্রভৃতি মাপকাটির সহিত না মিলিতে পারে। কিন্তু উজ্জ্বল গৌরবর্ণে মুখে এম্‌নি একটি স্বচ্ছ সুমিষ্ট সুন্দর ভাব—যাহা আমার কাছে কি বলিব!—আমার স্ত্রী গৃহকর্ম্মে অপরাজিতা। এ বিষয়ে আমার আত্মীয় স্বজন সকলেই সাক্ষ্য দিবেন।

কিন্তু তবুও আমার মনে সুখ নাই। সংসারের হিসাব পত্র আমাকে রাখিতে হয় না, আমার স্ত্রীই রাখেন। ঘড়ি-ধরা সময় মত আহার পাই, রোগে শুশ্রূষা পাই, সুন্দর মুখ চব্বিশ ঘণ্টা কাছে কাছে দেখিতে পাই—তবুও আমার মনে সুখ নাই। মিষ্টি মুখে এত শুষ্কতা, এত তীব্রতা! সুন্দর ফুল এত গন্ধহীন! ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আহার না পাইলেও চলে, সংসারের হিসাব পত্র কষ্টে সৃষ্টে দেখা যায়; কিন্তু যাহা না হইলে জীবন থাকা আর না থাকা সমান, সেই পদার্থ হইতে আমি বঞ্চিত ছিলাম। আমার স্ত্রীর কর্ত্তব্যের ত্রুটি ছিল না, কলের মত কাজ

করিতেন, ভালবাসিবার তাঁহার বড একটা অবসর ছিল না। কখনও মিষ্ট কথা কিম্বা স্বেচ্ছাকৃত আদর আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। হয় ত আমিই তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

প্রত্যহই আফিস যাই। মামার খাতিরে, সকলেই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। অল্প দিনের মধ্যে আফিসের কাজ কর্ম্ম আমার বেশ অভ্যস্ত হইয়া আসিল। সকালে দশটা বাজিতে না বাজিতে আফিস যাই, আর বেলা পাঁচটার সময় কাগজপত্র বগলে করিয়া শ্রান্তদেহে একাকী সুদীর্ঘ ধান্যক্ষেতের মধ্য দিয়া বাড়ী ফিরি।

বাড়ী ফিরিয়াই দেখি, দাওয়ায় ঘটিট গামছাটি ও ঘরের মেঝেয় জলখাবার সব প্রস্তুত রহিয়াছে। গৃহিণী গৃহকর্ম্মে ব্যস্তা। মুখ হাত ধুইয়া কিঞ্চিৎ উদরস্থ করিয়া একখানা বই হাতে লইয়া পড়িতে বসি। তখন চামেলী গাছ অজস্র সুমিষ্ট গন্ধ উদ্গীরণ করিয়া আমার শ্রান্ত মনকে কি যেন স্মরণ করাইয়া অধিকতর শ্রান্ত করিয়া তুলিত। সন্ধ্যা হইলে কখনও কখনও মাঠে একটু বেড়াইয়া আসি। তাহার পর অল্প স্বল্প আফিসের-কাজ দেখিয়া আহারান্তে শয়ন করি।

সে দিন বড়ই মধুর জ্যোৎস্নারাত্রি। স্বচ্ছ নীল আকাশ। স্নিগ্ধ তরল আলো সমস্ত দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে।

দূরে সারি সারি মহুয়া গাছ স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় দণ্ডায়মান। কোথাও খোয়াইয়ের মধ্যে একটু আধটু জল চিক্ চিক্ করিতেছে। আমি দাওয়ায় ইজি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। সহসা কি ভাবে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঠিয়া ঘরে ঢুকিলাম। আমার স্ত্রী পান সাজিতেছিলেন। আস্তে আস্তে তাঁহার কাছে গিয়া বসিলাম। এ কথা সে কথার পর বলিলাম, প্রণদা, পিতা আমার অল্প বয়সে বিবাহ দিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছেন। আমি দুঃখী, আমাকে বিবাহ করিয়া কেবল তোমারই কষ্ট। আবার ত শীঘ্রই একটি নূতন প্রাণী আমাদের সংসারে আসিতেছে (আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন)। সময়ে সময়ে বড়ই ভাবনা উপস্থিত হয়। স্ত্রী বলিলেন, ভাল করিয়া কাজ কর, যাহাতে মাহিনা বাড়ে, তাহারই চেষ্টা দেখ। হায়, এমন জ্যোৎস্নাভরা সুন্দর রজনী, এমন সুন্দর মুখ, আমার চিত্ত-চকোর উন্মুখ, এরূপ অবস্থায় এই অপ্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ত নিষ্ঠুর উত্তর আমার বুকে বড়ই বাজিল। আমি উঠিয়া ইজি-চেয়ারে গিয়া বসিলাম। মর্ম্মভেদ করিয়া চোখ দিয়া জল বহিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আমার একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে।

এক দিন অপরাহ্নে আফিস হইতে বাড়ী আসিয়াছি। ছেলেকে কোলে করিয়া বাগানে চামেলি ফুল তুলিয়া দিতেছিলাম। এমন সময়ে দেখি, এক জন পাদ্রী সাহেব উলঙ্গ মৃতপ্রায় একটি বালককে কোলে লইয়া আমাদের বাড়ীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, "এই দুর্ভিক্ষের সময় এই ছেলেটিকে একটি ক্ষেতের মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছি। ইহার চেহারা দেখিয়া ইহার অবস্থা সবই বুঝিতে পারিতেছেন। যদি দয়া করিয়া কিছু ক্ষণের জন্য ইহাকে আপনার বাড়ীতে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে ছেলেটি বাঁচিতে পারে। আমার বাড়ী এখান হইতে অনেক দূরে, সেখানে লইয়া যাইতে যাইতে হয় ত ইহার বিপদ সম্ভাবনা।" আমি সাহেবকে সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ী আনিলাম। দুই জনে মিলিয়া বালকটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পরিষ্কার করিয়া একখানি কাপড় পরাইয়া দিলাম। তাহার পর খানিকটা গরম দুধ খাওয়াইলাম। অনেক চেষ্টা ও যত্নে বালকটি একটু সুস্থ হইলে আমার স্ত্রীর জিম্মায় তাহাকে রাখিয়া আমরা দুই জনে বাহিরে আসিয়া বসিলাম।

পাদ্রী সাহেব আপনার জীবনের কথা, ধর্ম্মের কথা

বলিতে লাগিলেন। পিতার অগাধ বিষয় ছাড়িয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতে এদেশে আসিয়াছেন। পিতার মত ছিল না যে, চর্চ্চে প্রবেশ করেন, কিন্তু পুত্রের একান্ত জিদ্ দেখিয়া শেষে আর কিছু বলিলেন না। বড় ঘরের এক কন্যার সহিত ইহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল, প্রচার-কার্য্যে ভারতবর্ষে আসিতেছেন শুনিয়া কন্যার পিতা শেষে বাঁকিয়া বসিলেন। দেখিলাম, ক্রাইষ্টের কথা কহিতে কহিতে ইহার দুই চক্ষু বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কি ধর্ম্মভাব, কি জীবন্ত বিশ্বাস, কি জলন্ত প্রেম ও নিষ্ঠা, উপাস্য দেবতার চরণে আত্মবলিদান দিয়া কি স্বাচ্ছন্দ্য-অনুভব!—সমুন্নত বলিষ্ঠ দেহ ক্রূশের সম্মুখে যেন তৃণের মত কাঁপিতেছে! বলিতে লাগিলেন, খ্রীষ্টধর্ম্ম বড়ই মধুর। আত্মাকে একেবারে পরিষ্কার, একেবারে আকাঙ্ক্ষাশূন্য করিতে হইবে,—তবে প্রভু আসিয়া হৃৎপদ্মে বসিবেন। যিনি আমাদের পাপভার হরণ করিতে দয়া করিয়া পৃথিবীতে আসিলেন, তাঁহাকে কার্য্যে বচনে মননে প্রত্যক্ষীভূত করিতে হইবে। আমি সহজে কাহাকেও খ্রীষ্টান করি না। কেহ খ্রীষ্টান হইতে আসিলে আমি তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য দুই চারিবার ফিরাইয়া দিই। তাহার পর যদি দেখি, পিপাসা অতি প্রবল, তখন

ধর্ম্মে দীক্ষিত করি। কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন সাহেব আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ছেলেটিকে কোলে করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। সে দৃশ্য আমি আর জীবনে ভুলিব না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার কথা আমার কাণে বাজিতে লাগিল। রাত্রে স্বপ্নে তাঁহাকে দেখিলাম।

প্রত্যহই পাদ্রী আমাদের বাড়ী আসেন। প্রত্যহ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলাপ হয়। আমার আর তাঁহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। যীশু খ্রীষ্টের একখানি সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আমাকে উপহার দিয়াছেন,—সেখানি সযত্নে ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছি। অবসর পাইলেই বাইবেল পাঠ করি। ক্রমশঃ আমার মনে বিপ্লব উপস্থিত হইল। সে কি যন্ত্রণা!

যাহার দুঃখের আর সীমা নাই, সে দুঃখ ভুলিবার উপায় খুঁজিয়া বেড়ায়,—কেহ মন্দ পথে গিয়া মদ খায়, কেহ প্রভুর চরণ সার করিয়া উদ্ধার পায়। সংসারের সহিত আমার সম্বন্ধ সুখের নয়,—দেবতার সহিত আমার চিরসম্বন্ধ হউক্! বিষয় বিভব ত্যাগ করতঃ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই দীর্ঘবপু তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী শ্বেতপুঙ্গব এত সুখ পাইল, আমি কি তাঁহাতে আত্মনিবেদন করিয়া শান্তি পাইব না?—কে যেন বলিল, "বিশ্বাস কর অবশ্যই পাইবে!"

আমার স্ত্রীর নিকট এক দিন আমার মনের ভাব প্রকাশ করিলাম। আমার স্ত্রী বলিল, মরণ আর কি, খ্রীষ্টান হবার আবার সাধ গেছে !

২

ফাল্গুন মাস। সন্ধ্যাবেলায় আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। মধুর বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পশ্চিমে গোলাপ সুন্দর রঙ ফলাইয়া স্তরে স্তরে ফুটিয়া আছে। আমি সুখে নৃত্য করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছি। আমার আনন্দ দেখে কে! বাড়ীতে ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে আমার স্ত্রীকে বলিলাম, আজ আমি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছি। স্ত্রী ধুলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পর-দিনই তিনি আমাকে ছাড়িয়া কলিকাতায় পিত্রালয়ে গমন করিলেন। আমার কলিকাতার পৈতৃক বাটী স্ত্রীর নামে লিখিয়া দিলাম।

পাঁচ বৎসর সমানভাবে কাজ করিলাম। আমার উন্নতিও হইতে লাগিল। মাসে মাসে কিছু রাখিয়া অল্প-স্বল্প টাকাও জমাইলাম। শেষে আর ভাল লাগিল না, কাজ ছাড়িয়া দিয়া এস্তানসোলে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

খোলার ঘরে থাকি। আসবাবের মধ্যে একখানি

খাটিয়া আর লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য খান দুই চেয়ার। ঘরের পাশে একটা মাটির উনান,—স্বহস্তে চা রুটি তৈয়ারি করিয়া খাই। কুলুঙ্গির উপর একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স—প্রতিবাসীদের অসুখ বিসুখে ঔষধ দিই। জীবনের সাথী একখানি বাইবেল রহিয়াছে—কখনও কখনও পড়ি। অধিকাংশ সময় ঊর্দ্ধ-নেত্রে পরিত্রাতার পানে চাহিয়া থাকি। বেতনভোগী মিশনরীদের সঙ্গে আমার বড় একটা বনিবনাও ছিল না। তাঁহাদের পুঁথিগত ধর্ম্ম আমার ভাল লাগিত না। আমার আজিমগড়ের সাহেব কখনও কখনও আসিতেন—তখন আমার আনন্দের আর পরিসীমা থাকিত না। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে যখন কলিকাতায় যাই, আমার এক খ্রীষ্টান বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া উঠি। সেখান হইতে শ্বশুরবাড়ী গিয়া আমার ছেলেকে একবার দেখিয়া আসি। আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করিতেন না। আমার পরম সৌভাগ্য,—আমার ছেলেকে কাছে আসিতে কেহ নিষেধ করিতেন না। কখনও কখনও ইচ্ছা হইত আমার ছেলের জন্য কিছু খাবার সামগ্রী কিনিয়া লইয়া যাই—কিন্তু সাহস করিতাম না; আমার ছোঁয়া কি তাহাকে খাইতে দিবে!

আরও পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেছে। আমি কলিকাতায় আসিয়া সকাল বেলা পুত্রের সহিত দেখা করিতে গেলাম। দেখি রকের উপর সানাই বাজিতেছে। গৃহ লোকে পরিপূর্ণ। শুনিলাম, আজ আমার পুত্রের উপনয়ন। ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, আবার কি ভাবিয়া নিতান্ত অপরিচিতের মত সভার এক কোণে গিয়া বসিলাম। বিদ্ধকর্ণ মুণ্ডিতমস্তক পুত্র পীঁড়ার উপর বসিয়া আছে, পুরোহিত মন্ত্র দিতেছেন। সহসা উর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখি, আমার স্ত্রী চিকের মধ্য হইতে তাম্বুলরাগরঞ্জিত ওষ্ঠে হাসিতে হাসিতে উৎসব দেখিতেছেন। সে হাসি যেন আমাকেই বিদ্রূপ করিতেছে। আমি চক্ষু দুটি ফিরাইয়া লইলাম। উৎসবশেষে পকেট হইতে একখানি ছোট বাইবেল বাহির করিয়া পুত্রের ভিক্ষাঝুলির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বন্ধুগৃহে ফিরিলাম।

দুই দিন পরে এস্থানসোলে আসিয়া দেখি, আমার প্রদত্ত বাইবেলখানি খাটিয়ার উপর পড়িয়া আছে। ডাকযোগে প্রেরিত হইয়াছে।

অনুতাপ

বিনয়ের সঙ্গে শান্তির যখন বিবাহ হয়, তখন শান্তির বয়স তের বৎসর। শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া শান্তির বনিবনাও করিয়া লইতে বেশী দিন লাগিল না। হিন্দুর ঘরের মেয়ে, বিবাহের পূর্ব্বেই শ্বশুরবাড়ার সকলের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহার একরকম অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। স্বামী যে দেবতা, শ্বশুর শাশুড়ী যে গুরুজন, ভাসুরকে দেখিলে যে ঘোমটা দিতে হয়, স্বামীর উচ্ছিষ্ট আহার যে স্ত্রীর কর্ত্তব্য, এ সকল বিষয়ে দেখিয়া শুনিয়া তাহার বেশ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্ব দিনে শান্তির পিতা এ সকল বিষয়ে যাহাতে কোন ত্রুটি না হয়, তজ্জন্য বার-বার বলিয়া দিয়াছিলেন। শ্বশুরবাড়ী আসিয়া শান্তি প্রথম প্রথম যন্ত্রবৎ যথাকর্ত্তব্য পালন করিত, ক্রমে সে যান্ত্রিক ভাব গিয়া স্বামীর প্রতি তাহার স্বাভাবিক ভালবাসা এবং গুরুজনের প্রতি স্বাভাবিক ভক্তি জন্মিল। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে সে শ্বশুরবাড়ীর সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠিল।

বাস্তবিকই শান্তি খুব ভাল মেয়ে। বাপের বাড়ীতে

ভাই বোন বাপ মা আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাহার যে কি টান ছিল, তাহা বলা যায় না। হাজার সুন্দরী মেয়ে বাড়ীতে আসিলে সে তাহার ছোট বোনটির অপেক্ষা কাহাকেও অধিক সুন্দর দেখিত না। অন্য কেহ বহুমূল্য জিনিষ দিলে তাহাতে তাহার মন উঠিত না, কিন্তু বাবা যদি আদর করিয়া সামান্যও একটি জিনিস দিতেন, অমনি সে আনন্দে আটখানা হইয়া যত্নে তাহা বাক্সে উঠাইয়া রাখিত।

শান্তির দুই বৎসরের বড় একটি ভাই ছিল। দাদাকে শান্তি আপনার প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসিত। কেহ কিছু খাবার দিলে শান্তি অমনি বলিত,—"দাদাকে দেবে না?"—দাদাকে ভাগ না দিয়া, কিম্বা দাদা না খাইলে, সে কোন জিনিস খাইত না। দাদাকে যদি কেহ ধমকাইত, দাদার কাঁদিবার আগে শান্তির চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িত। ছোট বোনটিকে শান্তি নিজের হাতে স্নান করাইয়া দিত, খাওয়াইত, এবং সে যখন ছোট ছোট দু'খানি হাত ঘুরাইয়া "চুড়ি চাই, বালা চাই" বলিত—শান্তি স্নেহচক্ষে দেখিত, যেন আনন্দে সমস্ত জগৎটাও তাহার সঙ্গে ঘুরিতেছে। এইরূপ ভগ্নপক্ষ বিস্তার করিয়া মুখাগ্রভাগে স্নেহচঞ্চু লাগাইয়া

যে, পোষা পাখীটি এতদিন পড়িয়াছিল, সে যখন চলিয়া গেল, পিতৃগৃহে কি হাহাকার উঠিয়াছিল, তাহা কল্পনা করা কিছু দুরূহ নহে।

শান্তির স্বামী বিনয় একরকম অদ্ভুত গোছের লোক ছিল। তাহার কাছে জগতের সমস্তই যেন ফাঁকা ফাঁকা বলিয়া বোধ হইত। তাহার কাছে পাপ পুণ্যের কোনই প্রভেদ ছিল না। "তুমিও যেমন!" "তা বেশ!" ইত্যাদি কথা চব্বিশ ঘণ্টাই তাহার মুখে লাগিয়াছিল। বিনয়ের কাছে যদি কেহ বলিত, "অমুক লোকটা খুব ফাঁকি দিয়াছে"—বিনয় অমনি গম্ভীরভাবে বলিত, "লোকটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করিয়াছে।" এক কথায় বিনয় অতিশয় হাল্‌কা রকমের লোক ছিল, অন্ততঃ আপনাকে সেইরূপ দেখাইতে চেষ্টা করিত।

বিবাহের দুই মাস পরে বিনয়ের বি-এ পাশের খবর বাহির হইল। তাহার পিতা অম্বিকা বাবু ব্যারিষ্টার হইবার জন্য তাহাকে বিলাত পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। অম্বিকা বাবু খুব সঙ্গতিপন্ন, এবং দলের একরকম কর্ত্তা ছিলেন, সুতরাং ছেলেকে বিলাত পাঠানর পক্ষে তাঁহার কোন বাধা ছিল না। তবে গৃহিণী কখনও নথ নাড়া, কখনও নাক ঝাড়া দিয়া দুই

দশ দিন বাধা দিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু শেষে তাহাও ব্যর্থ হইল। ঠিক হইল, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে বিনয় বিলাত যাইবে।

পিতার নিকট হইতে শুনিয়া সেইদিনই রাত্রে শয়ন-কক্ষে বিনয় শান্তির নিকট বিলাত যাত্রার খবর দিল। শান্তি চুপ করিয়া রহিল। বিনয় বলিল, "আমি বিলেত গেলে তোমার কষ্ট হবে?" শান্তি কোন কথা কহিল না। বিনয় বলিল, "যদি জাহাজ ডুবে মারা যাই?" তবুও চুপ্। "বেশ ত আর একটা বিয়ে করবে"—এইরূপ বারবার বলাতে শেষে শান্তি আর না থাকিতে পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে দিন আর কোন কথা হইল না।

দিন ঘুনাইয়া আসিয়া শেষে চব্বিশ ঘণ্টারও কম ব্যবধানে দাঁড়াইল। কাল খুব ভোরে জাহাজ ছাড়িবে, আজ রাত্রেই বিনয়কে জাহাজে চড়িতে হইবে। আহারাদি শেষ করিয়া যখন বিনয় সকলের নিকট হইতে বিদায় লইতে গেল, তখন বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। শান্তি একলা একটা ঘরে চুপ করিয়া শুইয়াছিল। বিবাহরাত্রে বসনের গ্রন্থিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে দুইটি অপরিচিত নরনারীর হৃদয়ের গ্রন্থি কেমন করিয়া

বাঁধিয়া যায়! দুই মাসের মধ্যেই শান্তির বালিকাহৃদয় নবপরিচিত বিনয়কে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আপন করিয়া লইয়াছিল। পাছে কেহ টের পায়, এইজন্য, তাহার সেই অন্তর্দাহ এতক্ষণ সে অনেক কষ্টে চাপিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। কান্নার স্বর শুনিয়া সেও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

বিনয় একে একে সকলের নিকট বিদায় লইয়া শান্তির ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে কাঁদিতেছে। অনেক কষ্টে তাহাকে উঠাইয়া বিনয় সান্ত্বনা দিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার কান্না থামে না। যতই সান্ত্বনা পায়, আরও সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদে। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া শেষে শান্তির অশ্রুসিক্ত অধরে জীবনশোধ একটি প্রগাঢ় চুম্বন করিয়া "আমাকে কি মেনে চিঠি লিখো" বলিয়া বিনয় গাড়ীতে গিয়া বসিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি। জ্যোৎস্নায় পৃথিবীর দুই কূল ভরিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে কোকিলের পঞ্চমস্বর শূন্যতল প্লাবিত করিয়া উঠিতেছিল। এমন সুখময়ী জ্যোৎস্না-রাত্রে বিবাহের কয় মাস অতীত হইতে না হইতে এক-জন আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের উপায় সংগ্রহ করিতে

সাত সমুদ্র তের নদী পার হইতে চলিল, এবং আর একজন ক্ষুদ্র বালিকা—সে একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িয়া রহিল।

২

পরদিন হইতে মনের কষ্ট চাপিয়া শান্তি পূর্ব্বমত সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। পুত্রবিরহে অধীর হইয়া বিনয়ের মা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলেন, শান্তি নিয়ত তাঁহার কাছে থাকিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল। শাশুড়ীর কাতরতা দেখিয়া শান্তির যে স্বামীস্মৃতি কিছুমাত্র জাগিয়া উঠিত না, তাহা নহে; যখনই সুবিধা পাইত, একেলা নির্জ্জনে সে চোখের জল ফেলিয়া আসিত। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

বিলাতে পৌছিয়াই বিনয় শান্তিকে এক মস্ত চিঠি লিখিল। চিঠিটা আসিবামাত্র তাহা শান্তির দেবর সুরেশের হাতে পড়ে। ঠাকুরপো চিঠিটা লইয়া ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বৌঠাকরুণ, একটা সুখবর দিচ্ছি, কি দেবে?" বলিয়াই চিঠিটা বাহির করিয়া বলিল, "খুলি? পড়ি?"—শান্তি লজ্জায় অস্থির ও আরক্তিম হইয়া উঠিল। "ঠাকুরপো, কি কর, কি কর," বলিয়া ছুটিয়া

গিয়া চিঠিটা কাড়িয়া লইল। তারপর ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া কতবার যে চিঠিটা পড়িল, তাহার ঠিক নাই। শেষে আশ মিটাইয়া পড়িয়া বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

রাত্রে যখন সকলে শুইতে গেল, শান্তি নিজের ঘরে আসিয়া বাতি জ্বালাইয়া চিঠির জবাব দিতে বসিল। কত কাগজ ছিঁড়িয়া কত কি ভাবিয়া আঁকা-বাঁকা অক্ষরে শেষে লিখিল, "শ্রীচরণেষু, তোমার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত সুখী হলুম! তোমার চিঠি না পেলে আমার বড় কষ্ট হবে। তুমি কেমন থাক লিখ্‌তে ভুলো না। মা বাবা বাড়ীর সব ভাল। আমি এক রকম আছি। প্রণাম জেনো। শীগ্‌গির উত্তর চাই। আর কি লিখিব।"—শেষে নাম সইয়ের জায়গায় আবার মুস্কিলে পড়িল। বিনয় লিখিয়াছিল, "তোমার হতভাগা বিনয়।" শান্তি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল, "তোমার হতভাগিনী শান্তি।"

চিঠিটা মুড়িয়া ঠিকানা লিখিয়া দিবার জন্য সকালে আবার ঠাকুরপোকে ধরিল। ঠাকুরপো আবার ভারি দুষ্টুমি আরম্ভ করিয়া দিল। "কি লিখেছ যদি দেখাও তবে ঠিকানা লিখে দেব।" অনেক সাধ্যসাধনার পর

অনেক মাথার দিব্য দিয়া শাস্তি ঠাকুরপোকে চিঠি দেখা হইতে নিরস্ত করিল। ঠাকুরপো ঠিকানা লিখিয়া দিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে নিজ হস্তে চিঠি ডাকে দিবে, এবং কখনও খুলিয়া দেখিবে না।

চিঠি পাইয়া সম্বোধন দেখিয়া বিনয় মনে মনে হাসিল বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যেক অক্ষরে শাস্তির সেই বালিকা-সুলভ সরল ভাব প্রতিফলিত দেখিল। উত্তর লিখিবার সময় বিনয় আপনার মনোমত শ্রুতিমধুর কতকগুলি সম্বোধন লিখিয়া পাঠাইল। শাস্তি স্বামীর ইচ্ছামত প্রত্যেকবার তৎপ্রেরিত এক একটি সম্বোধন লইয়া চিঠি লিখিত।

বছর দেড়েক বিনয় রীতিমত চিঠি লিখিয়াছিল। ক্রমে তাহার চিঠি লেখা সম্বন্ধে শিথিলতা দেখা দিল; এমন কি, তিন চারি মাস অন্তর শাস্তি একখানি চিঠি পাইত, এবং শেষাশেষি তাহাও বন্ধ হইল। চিঠি না লিখিলে যে আপনা হইতে চিঠি লিখিবে, লজ্জাসঙ্কুচিতা শাস্তির সেরূপ প্রকৃতিই ছিল না। অনেকে অনেক কথা বলিতে লাগিল। অম্বিকা বাবু চিঠিপত্র না পাইয়া টেলিগ্রাফ করিয়া জানিলেন, বিনয় ভাল আছে। সহসা স্বামীর এই অবহেলাভাবের কারণ ঠিক করিতে না

পারিয়া শান্তি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিত যে, হয় ত পরীক্ষা কাছাকাছি আসাতে বিনয় চিঠি লিখিবার অবসর পান না।

৩

তিন বৎসর পরে একদিন টেলিগ্রাম আসিল যে, বিনয় ব্যারিষ্টারী পাশ হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

সে দিন সন্ধ্যায় শান্তি ছাতে বসিয়াছিল। কত কথাই মনে আসিতেছিল। বর্ষায় মেঘ, জল ও বাতাসে যেমন মারামারি হয়, শান্তির মনের মধ্যেও তেমনি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার সেই বাপের বাড়ী, পুতুলখেলা, বাপ মা ভাই বোন, সকলকে একে একে মনে পড়িল; তাহার পর বিবাহের কথা, দুই মাস ভরিয়া স্বামীর আত্যন্তিক ভালবাসার কথা, তিন চারি বৎসরের বিরহের কথা, চিঠি না লেখার কথা, একটার পর একটা আসিয়া মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। শান্তি এখন ষোড়শী, নববিকশিত পরিপূর্ণ যৌবনভার লইয়া সে আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিল, চোখে জল আসিল। এমন সময় সুরেশ আসিয়া হাসিতে হাসিতে খবর দিল, "দাদা বাড়ীর জন্যে ছেড়েছেন,

শাগ্গির আস্‌চেন, আজ টেলিগ্রাম এসেছে।" সুরেশ শান্তির ভাবগতিক দেখিয়া আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। শান্তিও অল্পক্ষণ পরে নীচে নামিয়া আসিল।

নীচে আসিয়া বিনয়ের লেখা চিঠিগুলা শান্তি আব একবাব আদ্যোপান্ত পড়িল,—পড়িয়া ভাল করিয়া গুছাইয়া একটি ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিল।

৪

বম্বে পৌছিযাই বিনয় টেলিগ্রাফ করিল। বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বাড়ী পরিষ্কার করিতে লোক লাগিল। বিনয়ের বসিবার জন্য টেবিল, চৌকি, ছবি, কার্পেট দিযা একটি ঘর সুসজ্জিত হইল। আলাদা একটি ডাইনিংরুম্‌ও ঠিক হইল।

বিনয়ের আসিবার পূর্ব্বদিন দরজায় মঙ্গলঘট ও কদলী-বৃক্ষ স্থাপিত হইল; নহবৎ বাজিতে লাগিল। আমোদে আহ্লাদে গল্পে রাত কাটিয়া গেল।

খুব ভোরে উঠিয়া অম্বিকা বাবু ও সুরেশ বিনয়কে আনিতে ষ্টেশনে গেলেন। এদিকে শান্তিকে সাজাইয়া দিবাব জন্য সকলে ধরিল। শান্তি অনেক ওজর আপত্তি

করিল, কিন্তু যখন আর কিছুতেই পারিয়া উঠিল না, তখন যে যাহা ইচ্ছা করিল, বিনা আপত্তিতে তাহাই করিতে দিল। স্নান করাইয়া, খোঁপা বাঁধিয়া দিয়া নীলাম্বরী পরাইয়া, গলায় ফুলের মালা দিয়া, মল বাজুবন্ধ প্রভৃতিতে সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া তাহার ঘরে লইয়া গিয়া সকলে মিলিয়া তাহাকে খাটে বসাইল। শান্তি পুত্তলিকার মত বসিয়া রহিল।

বাড়ীতে আসিয়াই বিনয় খটমট্ করিয়া প্রথমে শান্তির ঘরে প্রবেশ করিল। শান্তি অমনি ঘোমটা টানিয়া দিল। O' you look like a princess বলিয়া ঘোমটা খুলিয়া দিয়া বিনয় সকলের সমক্ষে শান্তির মুখচুম্বন করিল—শান্তি লজ্জায় মরিয়া গেল। সকলে বিনয়ের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া অবাক হইল। যে ধুতি পরিয়া ফিন্‌ফিনে উড়ানি উড়াইয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কথা কহিত, পৃথিবীর সমস্ত ফুঁদিয়া বেড়াইত—সে আজ নিতান্ত কাটখোট্টা ফিরিঙ্গীর মত হইয়া আসিয়াছে। খাবার সময় বিনয় শান্তিকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া টেবিলে বসাইল—বসাইয়া তিন চারি বৎসরের বিরহের পর এই প্রথম সম্মিলনে নিতান্ত অরসিকের মত কাঁটা চামচ কি করিয়া ধরিতে হয় শিখাইতে লাগিল। লজ্জায় শান্তির মুখ লাল হইয়া

উঠিল, এবং গা দিয়া ঘাম বহিতে লাগিল। সে কিছুই স্পর্শ করিল না। কিছুতেই না পারিয়া বিনয় শেষে হার মানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

বিলাতে থাকিতে বিনয়ের বিলক্ষণ পানদোষ জন্মিয়াছিল। প্রথম রাত্রেই সে তর্ হইযা আসিয়া শান্তিকে ইংরাজি বাঙ্গালায় লম্বা চওড়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে দিতে শেষে শান্তির প্রতিও বাক্যবাণ বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল। টেবিলে কাঁটা চামচ দিয়া খাওয়া, গাড়ী হাঁকাইয়া যাওয়া, গাউন পরা, স্ত্রীলোকদের যে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল। শান্তিকে চুপ করিযা থাকিতে দেখিয়া বিনয়ের রাগ আরও বাড়িতে লাগিল—"যা বল্‌চি কর্‌বে ? বল ? বল ? বল ?"

শান্তি আস্তে আস্তে বলিল, "হা"।

পরদিন বিনয় তাহার বিলাত-প্রত্যাগত জনৈক বন্ধুর স্ত্রীকে আনাইযা আধুনিক শিক্ষিতা স্ত্রীলোকদের মত শান্তিকে কাপড় পরা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে অনেকবার চেষ্টা করিয়া শান্তি এক রকম শিখিয়া লইল। তাহার পর হইতে কল্‌-এ, ইভনিং-পার্টি, টী-পার্টি প্রভৃতিতে বিনয় শান্তিকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

শান্তি কত পায়ে পড়িত, কাঁদিত, বিনয় করিত—বিনয় তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিত না। শান্তি ঘোম্‌টা দিতে গেলে বিনয় তাহা খুলিয়া দিত। শত শত নরনারীর মেলায় শান্তি ঘাড় হেট করিয়া বসিয়া থাকিত, এবং মনে মনে পৃথিবীকে দ্বিধা হইয়া তাহাকে লইবার জন্য প্রার্থনা করিত।

ইহার উপর বিনয় প্রায়ই রাত্রে বাড়ী আসিত না। শান্তি না খাইয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিত। কখনো কখনো দ্বিপ্রহর রাত্রে মত্ত অবস্থায় বিনয় বাড়ী আসিয়া শান্তিকে অকথ্য গালি দিত, এবং নানা প্রকারে লাঞ্ছনা করিত। সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া কেহ যেন তাহা টের না পায়, সেই জন্য শান্তি প্রাণপণে চেষ্টা করিত। শান্তির কাছে বিনয় "আমারি দেবতা তুমি দোষে গুণে।"

শান্তি যতদূর পারে বিনয়ের মন রাখিয়া চলিতে লাগিল। সাহেবী মেজাজ বিনয় যখন যাহা বলিত, শান্তি তাহাই করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। সে নিজে ইচ্ছা করিয়া একখানি ফার্ষ্ট-বুক-রিডিং আনাইয়া সুরেশের কাছে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। টেবিলে খাইতে ও ভাল করিয়া কাপড় পরিতে শিখিল। কোন পার্টিতে

গেলে সে আর ঘোম্‌টা দিত না, সকলের সঙ্গে মুখ ফুটিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিত। স্বামীর মনোরঞ্জনের আন্তরিক চেষ্টাসত্ত্বেও এত করিয়াও কিন্তু সে পাশ্চাত্যসৌন্দর্য্যবিমুগ্ধ বিনয়ের হৃদয়ে স্থান পাইল না।

দিন কাটিতে লাগিল।

৫

আজ সুরেশের বিবাহ। বাড়ীতে খুব ধুম পড়িয়াছে। ঝাড় লণ্ঠনের শব্দ ও চাকরবাকরদের হাঁকডাকে বাড়ী ভরিয়া উঠিয়াছে। ছেলেরা সকাল হইতেই ভাল কাপড় পরিয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে। ক্ষীর দই সন্দেশ প্রভৃতি একটার পর একটা আসিতেছে। দেবদারুপত্রশোভিত উচ্চ মঞ্চে নহবৎ আজিকার আনন্দোৎসব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। সন্ধ্যা সাতটার সময় লগ্ন।

আজ যথার্থ যদি কাহারও আনন্দ হইয়া থাকে ত সে শান্তির। সুরেশকে শান্তি ঠিক আপনার ছোট ভাইটির মত ভালবাসিত। বিনয় বিলাতে, থাকিতে দুই জনে একসঙ্গে বসিয়া আহার করিত, গল্প করিত, একজনের অসুখ হইলে অন্য জন সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেবা করিত। আজ সুরেশকে কি রকম করিয়া সাজাইয়া দিবে, তাহাই লইয়া শান্তি বিব্রত। নিজের

হাতে চন্দন বাঁটিয়া সুরেশের কপালে মাথাইয়া দিল, বিনয়ের একটি ভাল সিল্কের কামিজ সুরেশের জন্য বাহির করিয়া দিল, এবং গোপনে সুরেশের মুখে একটু রুজ পাউডারও মাথাইয়া দিল। সুরেশের সেই লজ্জানম্র মুখখানি যখন স্নেহ অঙ্গুলিপরিচালনায় ফুটিয়া উঠিল, তখন শান্তি আপনাকে বড়ই সৌভাগ্যবতী মনে করিল।

খুব সমারোহে বরযাত্রী বাহির হইল।

অনেক রাত্রে মত্ত অবস্থায় বিনয় বাড়ী ফিরিল। বাড়ী আসিয়া সুরেশকে সাজাইয়া দেওয়া উপলক্ষ্যে শান্তিকে ঠাট্টা করিতে করিতে তাহাকে এমন একটি তীব্র কথা বলিল, যাহা বিষময় শরের ন্যায় শান্তির মর্ম্মস্থলে গিয়া বিদ্ধ করিল। মদ খাইয়া বলিলেও বিনয়ের মনে যে অবিশ্বাসের ভাব কোন না কোন রূপে স্থান পাইয়াছে, তাহা শান্তির আর বুঝিতে বাকি রহিল না। অদৃষ্টদোষে সে স্বামীর ভালবাসা এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর সুখ হইতে বঞ্চিত, কিন্তু স্বামীর অকারণ অবিশ্বাস স্ত্রীর পক্ষে অসহনীয়। যে ক্ষুদ্র তরণী নদীপথে শত সহস্র বার যাতায়াত করিয়াছে, যে পথ ছাড়া তাহার দাঁড়াইবার আর অন্য স্থল নাই—ভীষণঝটিকাবর্ত্তে তরঙ্গাঘাতে উৎক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়া তাহা যেমন নিতান্ত অসহায়

হইয়া পড়ে, শাস্তির অবস্থাও ঠিক তাহাই হইল। শান্তি চুপ্ করিয়া রহিল—কোন কথা কহিল না।

পরদিন শান্তি বিছানা হইতে আর উঠিল না। অসুখ হইয়াছে বলিয়া সমস্ত দিন শুইয়া রহিল, আহারও করিল না। সুরেশ আসিয়া দেখিল, শান্তির মুখখানি যেন কালীর মত হইয়াছে, চোখ দু'টা বসিয়া গিয়াছে। সুরেশকে দেখিয়া অপমানিত ব্যথিত শান্তির হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, অনেক কষ্টে সে তাহা চাপিয়া রাখিল। সুরেশ পাখা লইয়া বিষণ্নমনে বসিয়া বসিয়া শান্তিকে বাতাস করিতে লাগিল। শান্তির ইচ্ছা তাহাকে বারণ করে, কিন্তু আজ হঠাৎ কি বলিয়া নূতন করিয়া বারণ করিবে!

অনিয়মে অত্যাচারে মনের কষ্টে শান্তি দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিল, এবং অবশেষে যাহা হইয়া থাকে, সাংঘাতিক ব্যাধি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল।

তিন মাস রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর ডাক্তার বলিল, রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রাতঃকাল, তথাপি সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না। ঘনান্ধকার মেঘগর্জ্জনে মুসলধারে অবিরল বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন অন্ধকার যে, দিনের বেলায় ঘরে আলো জ্বালিতে

হইয়াছে। সেইদিন দ্বিপ্রহরবেলায় নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় শান্তি সহসা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। উঠিয়া বসিয়া, বিলাতে থাকিতে শান্তি বিনয়কে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিল, বাক্স হইতে বাহির করিয়া একে একে সমস্ত ছিঁড়িয়া ফেলিল। গলার হার, কাণের সোণার ফুল, দুই একখানি ভাল কাপড় পুঁট্‌লি বাঁধিয়া একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ছোট বোনটির জন্য বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল, এবং সেই সঙ্গে কম্পিত হস্তে মাকেও একখানি চিঠি দিল। রেশমের কাপড়ের একটি পাড় শান্তি ভাল থাকিতে নিজ হাতে বুনিয়াছিল, সেটী সুরেশের বৌকে দিল। তাহার পর সুরেশকে কাছে ডাকিয়া কি বলিতে গিয়া আর বলিতে পরিল না।

পরদিন বেলা চারিটার সময়, বিনয় যখন বন্ধুগৃহে পার্টিতে গিয়াছিলেন, আত্মীয় স্বজনের আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি ইহলোকে চিরশান্তি লাভ করিল।

৬

শান্তির মৃত্যুর পর বিনয় মদ্য পান আরও বাড়াইল। অম্বিকা বাবু মর্ম্মাহত হইয়া বিনয়কে টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। বিনয় শেষে উপায়ান্তর না

দেখিয়া শান্তির ভাল ভাল দামী গহনা কাপড় যাহা ছিল, একে একে সমস্ত বিক্রয় করিল—যে যাহা পাইল, জলের দামে কিনিয়া লইল।

শনিবার। কাল কোর্ট বন্ধ। জ্যোৎস্না রাত্রে বন্ধুবান্ধবসমেত বিনয় পান্সী করিয়া গঙ্গায় হাওয়া খাইতে বাহির হইল। আমোদ আহ্লাদ করিয়া অনেক রাত্রে সকলে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিবার পথে বিনয় সবান্ধব এক অপরিচিত বারবনিতালয়ে প্রবেশ করিল।

সেখানে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিনয় একেবারে চমকিয়া উঠিল। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বোম্বায়ে বিনয়ের স্বহস্তে ক্রীত, রেশমীপুষ্পখচিত পুণ্য-তনুবেষ্টনে নিত্যপরিচিত শান্তির বড় আদরের বাদামী রঙ্গের শাড়ি জ্যাকেট্ পরিয়া, শান্তির পুণ্যকণ্ঠাশ্রিত হীরক নেক্‌লেস্ গলায় দিয়া, এবং বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তিরাজী সোণার ব্রোচ্ পরিয়া এক বারবিলাসিনী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। উজ্জ্বল দীপালোকে বিনয় সমস্তই স্পষ্ট দেখিতে পাইল। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় সে হা করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। নিস্তব্ধ রজনীতে শান্তির সেই বিষাদাঙ্কিত পবিত্র সুন্দর মুখখানি বিনয়ের চক্ষের সম্মুখে কেবলি ভাসিতে লাগিল। বন্ধুবান্ধবদিগের

দৃঢ় কবল হইতে আপনাকে সজোরে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাগলের ন্যায় বিনয় ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইল। অনুতাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, সর্ব্বান্তঃকরণ যেন কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—

"এস এস ফিরে এস, বধু হে ফিরে এস।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বধু হে ফিরে এস!"

জলাঞ্জলি

বৃদ্ধ হরশঙ্কর পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "হেমচন্দ্র, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, তুমি আমার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র; তোমার উপর সংসারের ভার দিয়া আমি কাশীবাসী হইব, মনঃস্থ করিয়াছি। বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু রাখিয়া গেলাম, সযত্নে রক্ষা করিও; অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিলে তোমাদেরই কষ্ট পাইতে হইবে—আমি আর কয় দিনই বা আছি! মনে সাধ ছিল—তোমাদের জন্য কত কি করিব; কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমাদের শরীর মন যাহাতে ভাল থাকে, তাহাই করিও। আর দেখিও বাবা, তোমার ছোট ভগ্নী হৈমবতীর যেন কোন রকম কষ্ট না হয়—তাহার কোন কষ্টের কথা শুনিলে আমি আর এ বৃদ্ধ বয়সে বাঁচিব না! বধূমাতাকে বলিয়া দিবে, তিনি যেন হৈমবতীকে আপনার মত দেখেন। জামাতা বিপিনের পড়াশুনা যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। নিয়মমত চিঠিপত্র লিখিও—আর কি বলিব—তোমরা সুখে থাকিলেই আমার সুখ।

হৈমবতীকে জন্মদান করিয়াই হরশঙ্করের স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হরশঙ্কর একাধারে জনক-জননী হইয়া কন্যাটিকে বুকে করিয়া মানুষ করেন। কন্যা যতই বড় হইতে লাগিল, তাহার আকৃতি প্রকৃতি ততই তাহার মাতার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যখন বয়স দশ কি এগারো হইবে, তখন মেয়েটিকে দেখিলে মনে হইত, যেন তাহার মায়ের মুখ অবিকলভাবে কে তার মুখে বসাইয়া দিয়াছে। চলন চালন ধরণ ধারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, কণ্ঠস্বর, হাসি, সকলই তাহার মায়ের মত। হরশঙ্কর অনেক সময়ে অবাক্ হইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন—কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য!—দেখিতে দেখিতে মৃত সহধর্ম্মিণীর সহস্র পূর্ব্বস্মৃতি সুখে দুঃখে মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া তাহার হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া তুলিত। মাতৃহারা ক্ষুদ্র বালিকা কি মন্ত্রবলে, কি বৃহৎ সৃষ্টিছাড়া স্নেহ-আকর্ষণে বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয় কাড়িয়া লইল, তাহা জ্ঞানের অগোচর।

হৈমবতী চৌদ্দবৎসরে পদার্পণ করিলে তাহার বিবাহের জন্য বৃদ্ধের বিপরীত ভাবনা উপস্থিত হইল। বিবাহান্তে কন্যা যে, পরগৃহে গিয়া বাস করিবে, ইহা ভাবিলেও বৃদ্ধের কষ্ট বোধ হইত। মনে মনে স্থির

প্রতিজ্ঞা করিলেন, কন্যার বিবাহ দিয়া জামতাকে ঘরে রাখিবেন।

অনেক অনুসন্ধানের পর হরশঙ্কর এক ভদ্র গৃহস্থের রূপবান্ পুত্রের সহিত খুব সমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং জামাতাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিলেন। আহার পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে হরশঙ্কর পুত্র হেমচন্দ্রের সহিত জামাতার সমান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুত্রকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পকেট খরচা দিতেন—জামাতারও তাহাই করিয়া দিলেন।

বিবাহের দুই বৎসর পরে হৈমবতীর এক পুত্রসন্তান জন্মলাভ করিল। বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নুতন বিষয় সম্পত্তি পাইলে লোকের মনে যত না সুখ হয়, বৃদ্ধ ততোধিক সুখী হইলেন। কিছু বড় না হইতেই শিশু আর বুড়ার কাছছাড়া হইত না—বৃদ্ধ সমস্তক্ষণ তাহাকে কোলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। "এটা দাও, ওটা দাও" করিয়া ছেলেটি বৃদ্ধকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। "দাদা, গগ যাব"—অম্নি গাড়ী জুতিতে বলিয়া বুলোকে (ছেলেটির আদরের নাম ছিল "বুলো") লইয়া বৃদ্ধ রাস্তায় একটু ঘুরিয়া আনিতেন। হরশঙ্কর তামাক খাইতে বসিলে বুলো তাহার মুখ

হইতে নল কাড়িয়া লইত—নিজে হাতে করিয়া দাদার মুখে নল পুরিয়া দিত—সে ধরিয়া থাকিবে আর দাদাকে তামাক খাইতে হইবে। শিশুর কাছে হার মানিয়া বুড়া একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন।

বিপিন কালেজে চলিয়া গেলে, হৈমবতী বৃদ্ধ পিতার আহারের আয়োজন করিত। কথনও কথনও সখ্ করিয়া পিতার জন্য স্বহস্তে ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া আনিত। আহারের সময় ছেলেটিকে কোলে করিয়া পিতার নিকট আসিয়া বসিত। দাদা আসনে আসিয়া বসিলেই বুলো গম্ভীরভাবে বলিত, "দাদা কাবে, কাও,—" যেন তাহার আজ্ঞার অপেক্ষায় দাদা এতক্ষণ বসিয়াছিলেন। দাদা কিছু মুখে তুলিয়া দিলে অমনি সে তাড়াতাড়ি বলিত, "বালো"—অর্থাৎ "আরো দাও।" শিশুর আধ আধ মিষ্ট কথাতে বৃদ্ধের নীরস প্রাণও যেন আনন্দে নৃত্য করিত।

পুত্রের নিকট হরশঙ্কর যেদিন কাশী যাইবার কথা উত্থাপিত করিলেন, তাহার পরদিন যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিলেন। আত্মীয় স্বজন সকলে আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হৈম-বতী বিষাদক্লিষ্ট সরল সুন্দর মাতৃমুখে আসিয়া যখন

পদধূলি গ্রহণ করিল, তখন বৃদ্ধের দুই চক্ষু বাষ্পে ভরিয়া উঠিল। হৈমবতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ মনের কষ্ট চাপিয়া কন্যার মস্তকের উপর শীর্ণ হাতখানি রাখিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "মা কাঁদিও না, তুমি চিরসুখী হও, আমার এই একমাত্র প্রার্থনা।" বুলো দাদার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "আমি গগ যাব।" হৈমবতী পাছে পিতার মনে কষ্ট হয়—ছেলেটিকে অনেক কষ্টে ভুলাইয়া লইল। বৃদ্ধ অন্ধকার মনে আস্তে আস্তে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। সোণার পুরী অন্ধকার হইয়া গেল।

২

হরশঙ্কর চলিয়া গেলে তাঁহার অভাব হৈমবতী ও তাহার পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিতে লাগিল। হৈমবতী নানা উপায়ে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিত। সে মনকে বুঝাইত—পিতা সুখে থাকিলেই আমার সুখ—পশ্চিমে থাকিলে এ বৃদ্ধ বয়সে তাহার শরীর ভাল থাকিবে,—চিঠিপত্রেওত, তাঁহার সংবাদ পাইব—ইত্যাদি। তবুও হাজার প্রবোধ সত্ত্বেও পিতার অদর্শনজনিত দুঃখ হৈমবতীকে ছাড়িল না। কিন্তু

শিশুর কাছে প্রবোধও নাই সান্ত্বনাও নাই, বিচারও নাই তর্কও নাই। সে মনে করিল, হঠাৎ একি হইল—দাদা কই! কোথায় গেল! সকালে দাদার পরিবর্ত্তে যখন ঝি আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন সে মনে মনে ভারি অপমানিত বোধ করিল। দাদা নাই, কাহার মুখে নল পূরিয়া দিবে, কে পাখী দেখাইবে, কে 'গগ' চড়াইবে—তাহার ভারি কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া সে দাদা মহাশয়ের ঘরে ঢোকে, আর "দাদা গগ গেছে, চলি গেছে" বলিয়া ম্লানমুখে ফিরিয়া আসে। তাহার খেলা বন্ধ হইল, খাওয়া বন্ধ হইল—সে দিন দিন যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। শিশুর কষ্ট হইলে কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল মনে মনে গুমরাইতে থাকে, সেইজন্য মনের কষ্টে তাহাদের শরীর একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। হৈমবতী ছেলেকে ভুলাইয়া অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে কিছুতেই আর দাদাকে ভুলিতে পারিল না।

ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে হরশঙ্করের অবর্ত্তমান হেতু সংসার একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্রের স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা বৃদ্ধ থাকিতে এতদিন

চুপ্‌চাপ্‌ করিয়া ছিল—কিছুই করিতে পারিত না, কিন্তু এক্ষণে তাহার সমস্ত রুদ্ধ আক্রোশ অতি নিষ্ঠুর ভাবে প্রকাশ বরিতে আরম্ভ করিল। শ্বশুর থাকিতে হৈমবতীর গহনাপত্র অনেক বেশী, সে নিঃসন্তান আর হৈমবতী পুত্রবতী,—হিংসায় ক্রোধে লাবণ্য এতদিন জ্বলিয়া পুড়িত। এক্ষণে সে ঝাল ঝাড়িতে লাগিল। প্রত্যেক বিষয়ে হৈমবতীর সহিত খুঁটিনাটি আরম্ভ করিল। এমন কি, নির্দ্দোষ শিশু বুলোও তাহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া দাঁড়াইল। "মামীমা! মামীমা" করিয়া বুলো লাবণ্যের কোলে উঠিতে যাইত, কিন্তু লাবণ্য তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিত না। পাছে স্বামীর পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, সেইজন্য হৈমবতী এ সকল বিষয়ে তাঁহাকে কিছুই জানিতে দিত না। নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিত। পিতাকে এসব বিষয়ে কিছুই লিখিত না। পথের ভিখারীণী হইলেও নিজের কষ্ট জানাইয়া পিতার মনে কষ্ট দিবে, হৈমবতীর এমন প্রকৃতিই ছিল না।

লাবণ্য হৈমবতীকে জব্দ করিবার জন্য যখন বুলোরও দুধের ভাগ কমাইয়া দিতে আরম্ভ করিল, তখন হৈমবতী স্বামীকে এ সকল বিষয়ে আর না জানাইয়া থাকিতে

পারিল না। বিপিন শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইল, কিন্তু সে আর কি করিবে, তাহার কি ক্ষমতা!—কেবল অক্ষমের চিরসম্বল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিবে না—ফাষ্ট আর্টস্ পাস করিলেই কোন উপায়ে একটা চাকরীর যোগাড় করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া আলাদা হইয়া থাকিবে।

লাবণ্য স্বামীর নিকট হৈমবতীর নামে রাত দিন অভিযোগ আরম্ভ করিল। হেমচন্দ্র তাহাতে বড় একটা কান দিত না। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া ঝড় বৃষ্টির উপর্য্যুপরি আঘাতে বৃহৎ অট্টালিকাও ভূমিসাৎ হইয়া যায়—লাবণ্য জপাইতে জপাইতে ক্রমে হেমচন্দ্রের মন ভগ্নীর বিরুদ্ধে ফিরাইয়া লইল, এবং শেষে এমনি একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে হেমচন্দ্র রীতিমত ভগ্নীদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন রাত্রে হেমচন্দ্র আহারাদি করিয়া শয়ন করিতে আসিলে লাবণ্য চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া কহিল, "ওগো শুনেছ, পাশের বাড়ীর মতি হালদার তার স্ত্রীকে বলেছে—কর্ত্তা উইলে অর্দ্ধেক বিষয় ঠাকুরঝির নামে দিয়েছেন। এই একটু আগে হালদারের স্ত্রী এসে আমাকে বলে' গেল। তা' হ'লে আমরা দাঁড়াই কোথায় বল!"—শুনিয়া হেমচন্দ্র শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া

দাঁড়াইল—"বল কি, সত্যি নাকি ?"—মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার অন্তর হইতে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া গেল—হৈমবতী তাহার পরম শত্রু, এবং যে কোন উপায়ে তাহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, ইহাই তাহার মনে জাগিতে লাগিল। মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিল,—এতদিন কেন সে লাবণ্যের কথা শুনে নাই। রাত্রে ঘুম হইল না।

পরদিন ভোর না হইতে হইতে সরকারকে ডাকিয়া হেমচন্দ্র বলিয়া দিল, "আমার বিনা অনুমতিতে বিপিন কিম্বা হৈমবতীকে এক পয়সাও দিবে না—যদি দাও, তৎক্ষণাৎ তোমায় দূর করিয়া দিব!" তাহার পর হেমচন্দ্র বিপিনের মাষ্টারকে ছাড়াইয়া দিল, তাহার পকেট-খরচা বন্ধ করিয়া দিল, এবং পিতাকে চিঠি লিখিল যে, কুসংসর্গে পড়িয়া বিপিন মাটি হইয়া যাইতেছে, পড়াশুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কাহারও কথা শোনে না, মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছে। এই সকল কারণে তাহার পকেট-খরচা বন্ধ করিয়া দিয়াছি; ইত্যাদি। উত্তরে বৃদ্ধ হরশঙ্কর লিখিলেন, "হেমচন্দ্র, জামাতার কথা শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমি ত এক্ষণে মৃত বলিলেই হয়।

তোমার উপর সংসারের সমস্ত ভার দিয়াছি, তুমিই আমার স্থানীয়। যাহাতে বিপিন সৎপথে আইসে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। দেখিও, অতি সাবধানে বিবেচনাপূর্ব্বক স্নেহের সহিত সকল কার্য্য করিবে। হৈমবতী কিম্বা জামাতার মনে যাহাতে কষ্ট হয়, এমন কার্য্য কখনও করিও না।” হৈমবতী বিপিন, কাহাকেও কিন্তু বৃদ্ধ এ সকল বিষয়ে কিছু লিখিলেন না।

হেমচন্দ্র যখন সমস্ত খরচ বন্ধ করিয়া দিল, হৈমবতী তখন আপনার গহনা বিক্রয় করিয়া আবশ্যক মত খরচপত্র চালাইতে লাগিল। ক্রমে সব নিঃশেষ হইয়া আসিল।

একদিন অপরাহ্নে বিপিনচন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিলে, হৈমবতী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, “আমার বুলোর গা যেন আগুণের মত তাতিয়াছে,—সারাক্ষণ সে কাঁদিয়া খুণ হইতেছে, মাথা চালাইতেছে, বরফ আনিতে বল, যাও শীঘ্র ছুটিয়া ডাক্তারকে লইয়া আইস!” শুনিয়া বিপিনের রক্ত জল হইয়া গেল। ডাক্তারের ভিজিটের টাকা কোথায় পাইবে, কাহাকে কি বলিবে, কে তাহার কথা শুনিবে! হৈমবতী তাড়া-

তাড়ি অবশিষ্ট কানের ফুল দুইটি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল। ঘরের মধ্যে কালেজের বইগুলা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চটিজুতা পায়ে বিপিন পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কানের ফুল দুইটি একজায়গায় পঞ্চমুদ্রায় বাঁধা দিয়া ডাক্তারের গৃহমুখে তীরবেগে চলিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাস্তায় একে একে গ্যাসের আলো জ্বালাইয়া দিল। আকাশে তারার আলো ফুটিয়া উঠিল। সহরের রাস্তা;—কোথাও ব্যাণ্ড বাজাইয়া বরযাত্রী খুব সমারোহে বাহির হইয়াছে, কোথাও পাঁচ ইয়ারে মিলিয়া গলা ধরাধরি করিয়া হাস্যকলরবে চলিয়াছে, কোথাও গৃহপ্রকোষ্ঠ হইতে সঙ্গীতধ্বনি মুখরিত হইতেছে, কোথাও আটচালার মধ্যে কেহ ভোজবাজি তামাসা দেখাইতেছে;—প্রতি পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব দৃশ্যপট। কিন্তু বিপিনের চক্ষের সম্মুখে সকলই ভাসিয়া গেল; সে দেখিয়াও কিছু দেখিতে পাইল না। তাহার মনে শুধু জাগিতেছে আপনার দারিদ্র্য ও প্রিয়তম পুত্র বুলোর অসুখের কথা। সে একমনে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দৌড়িয়া দৌড়িয়া প্রায় একঘণ্টা পরে বিপিন ডাক্তারের বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। আসিয়া শুনিল, ডাক্তার বাবু

বাড়ী নাই, রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন, কখন ফিরি-বেন তাহার ঠিক নাই। হতাশ্বাস হইয়া বিপিন ডাক্তারের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। এই ডাক্তারের উপর বিপিনের প্রগাঢ় বিশ্বাস, ইনিই তাহাদের বাড়ীর সকলকে দেখিতেন। যত দেরি হইতে লাগিল,—কালো মেঘের ন্যায় একটার পর একটা ভাবনা আসিয়া বিপিনের হৃদয়-আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল;—একেলা হৈমবতী ছেলেটিকে লইয়া না জানি কি করিতেছে, বিনি চিকিৎসায় ছেলেটি বুঝি মারা গেল! বিপিন একবার উঠে, একবার বসে, গাড়ীর শব্দ শুনিলেই বাহির হইয়া আইসে।

রাত্রি নয়টার পর ডাক্তার বাড়ী ফিরিলেন। বিপিন ডাক্তারকে সবিশেষ জানাইল। তিনি কহিলেন, "আমি এইমাত্র আসিয়াছি, আহারাদি করিয়া খানিক পরে যাইব।" বিপিন কাঁদিতে কাঁদিতে দুই হাত জোড় করিল, "ডাক্তার মহাশয়, আপনি দয়া করে' একবারটি চলুন—বুলো যায় যায়!" ডাক্তার অগত্যা বিপিনের সঙ্গে চলিলেন।

ডাক্তারকে লইয়া বিপিন যখন বাড়ী ফিরিল, তখন সকলে আলো নিবাইয়া যে যার ঘরে গিয়া শয়ন করিয়াছে। কেবল হৈমবতী একেলা পুত্রের শিয়রে বসিয়া আছে। বাড়ীতে ঢুকিয়া বিপিনের গা ছমছম করিতে লাগিল।

রোগীকে দেখিয়া ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বিপিনকে কহিলেন, "অবস্থা বড় ভাল দেখিলাম না। এই ঔষধ লিখিয়া দিতেছি—দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে, আর সমস্তক্ষণ মাথায় বরফ ঘষিয়া দিবে।" এই বলিয়া প্রেস্‌ক্রিপশন্ করিয়া পকেটে চারিটি মুদ্রা পুরিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

প্রেস্‌ক্রিপশন্‌টি হাতে করিয়া বিপিন অন্ধকারে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া সরকারকে উঠাইয়া কহিল, "সরকার মহাশয়, বুলো যায় যায়! দুইটি টাকা দিয়া দয়া করে' এই ওষুধটি আনাইয়া দাও—আমি যেমন করে' পারি কাল তোমাকে টাকা ফিরাইয়া দিব। তোমায় যোড় হাত করে' বল্‌চি এইটে কর!" সরকার মশায় দুইটি চক্ষু মুছিতে মুছিতে রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, "আমি টাকা পাব কোথায়? ঘর থেকে কি এনে দেব? বাবু এক পয়সাও দিতে বারণ করেছেন, আমি কিছুতেই দিতে পার্‌ব না! তোমার জন্য আমি কি শেষে চাকরি খোয়াব! শুনিয়া সমস্ত রক্ত বিপিনের মাথায় উঠিয়া গেল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সে কাঁপিতে কাপিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "পাষণ্ড! নির্ম্মম! তুই কুকুরের অধম!" গোলমাল শুনিয়া হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি নীচে নামিয়া আসিলে সরকার তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া দিল। শুনিয়া

হেমচন্দ্র বিপিনকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া গালি দিল। উত্তরে বিপিনও হেমচন্দ্রকে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল। তখন হেমচন্দ্র বিপিনের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিল এবং দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, বিপিনকে যেন কখনও বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া না হয়।

সেই রাত্রির শেষে দুই একবার "বাবা" বলিয়া ডাকিয়া বুলো মায়ের কোলে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল।

৩

অনাহারে পুত্রশোকে স্বামীর ভাবনায় মৃতপ্রায় হইয়া হৈমবতী দুই মাস কাটাইল।

ইহার মধ্যে একদিনও বিপিন বাড়ীতে আসে নাই। তবে পাশের বাড়ীর মতি হালদার একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে তাহাকে হরশঙ্করের বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

হৈমবতী মনে মনে ঠিক করিল, আর একমাস দেখিয়া তবে পিতাকে সম্বাদ দিবে।

একদিন সকাল বেলায় কাশীর বাড়ীর রকের উপর বসিয়া বৃদ্ধ হরশঙ্কর তামাক খাইতে খাইতে বাড়ীর কথা

ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে পুলিসের সবইন্‌স্পেক্টর একটি লোককে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কহিল, "মশায়, এই লোকটিকে কি চিনিতে পারেন? ইনি বিনা টিকিটে কেমন করিয়া কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছেন। ষ্টেশনে ইহাঁর নিকট টিকিট চাহিলে, ইনি পকেট হইতে একটি দেশলায়ের বাক্স বাহির করিয়া দেন। পুলিস ইঁহাকে ধরে। একজন ভদ্রলোক বলিলেন যে, 'ইনি হরশঙ্কর বাবুর জামাতা'—তাই ইন্‌স্পেক্টর বাবু আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন!"

শুনিয়া হরশঙ্কর কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুলিস কর্তৃক আনীত লোকটির মুখের কাছে মুখ আনিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে অনেকক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁ, একি! বিপিন! এমন বেশ, এমন চেহারা কেন? কি হইয়াছে? বাড়ীর সব ভাল ত? হৈমবতী বুলো ভাল ত?" পাছে শোক না সহ্য করিতে পারেন, তাই বুলোর মৃত্যুর কথা তাঁহাকে কেহ শুনায় নাই। বিপিন বৃদ্ধের মুখের পানে প্রায় পনের মিনিট হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "বুলো, ওষুধ।"

হরশঙ্করের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বিপিনের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

. টিকিটের দাম দিয়া হরশঙ্কর পুলিসের লোককে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহার পর বিপিনকে ভাল করিয়া তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া খাওয়াইলেন। বুড়ার আর সেদিন খাওয়া হইল না। সমস্তক্ষণ জামাতাকে কাছে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

হরশঙ্কর বিপিনকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহারই উত্তরে সে বলে, "বুলো, ওষুধ।" বৃদ্ধ বিপিনের হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, হয় ত মদ খাইয়া মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, আবার ভাবিলেন, না, তাহা নহে। ঠিক খবর জানিবার জন্য তিনি মতি হালদারকে চিঠি লিখিলেন। উত্তরে, মতি হালদার বুলোর মৃত্যুসংবাদ, হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক বিপিনের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়া, সকলি খুলিয়া লিখিল।

চিঠি পাইয়া হরশঙ্কর শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। দুই একদিন পরে কোন এক নিকট আত্মীয়কে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তাঁহার উপর সংসারের সমস্ত ভার দিয়া বিপিনকে তাঁহার সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আত্মীয়টিকে মাসিক একশত টাকা বেতনে ম্যানেজার স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। হেমচন্দ্রকে লিখিলেন, "তুমি আমার ত্যজ্যপুত্র হইলে, তোমার

আর মুখ দেখিতে চাহি না। বিষয় সম্পত্তি সমস্ত হইতে তুমি বঞ্চিত হইলে। উইলে সমস্তই হৈমবতীকে দিলাম।"

সত্য সত্যই এক উইল করিয়া সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হৈমবতীর নামে লিখিয়া দিলেন। একটা বাক্সে পুরিয়া উইলটা হৈমবতীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধের আর বেশী দিন সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। একমাস যাইতে না যাইতে তাঁহার কাশীলাভ হইল।

৪

বিপিন যখন বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল, তাহাকে দেখিয়া হৈমবতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পরে যখন সংজ্ঞালাভ হইল, ফোঁপাইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের ভাব যখন ঈষৎ লঘু হইল, উঠিয়া স্বামীর নিকট গিয়া বসিল। তাহার সেই মলিন রেখাঙ্কিত মুখ, অস্থিপঞ্জরসার দেহ, অর্থহীন চাহনি দেখিয়া হৈমবতীর প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। বিপিন অনেকক্ষণ একদৃষ্টে হৈমবতীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, যেন সে সকলই বুঝিতে পারিতেছে,—কি বলিতে চাহে, কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া

হঠাৎ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া "বুলো, ওষুধ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হৈমবতী আর আপনাকে রাখিতে পারিল না। স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল।

দিনের পর দিন যায়। মনের কষ্ট চাপিয়া হৈমবতী স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর আপনার ঘরে বসিয়া হৈমবতী অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে হেমচন্দ্র আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া বসিল। দেখিল, হৈমবতী কাঁদিতেছে। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হেমচন্দ্র কহিল, "হৈম না বুঝিয়া অনেক দোষ করিয়াছি, মাপ কর্। বাবা তোকেই সর্ব্বস্ব দিয়ে গেছেন—আমাদের দাঁড়াইবার স্থান নেই, আমাদের জন্য কি কিছু সংস্থাপন কর্‌বিনে?" হৈম চক্ষু মুছিয়া কহিল, "দাদা, আমার আর কে আছে! বাবা ছিলেন তিনি গেলেন, বুলো বিনি চিকিৎসায় চলে' গেল, স্বামীর ত এই অবস্থা। সকলি ত জলাঞ্জলি দিয়াছি, বিষয় লইয়া আর কি করিব? ওঁর খোরাকপোষাক চিকিৎসার জন্য লেখাপড়া করে' একটা ভাল বন্দোবস্ত করে' দাও—আমি সকলি তোমাকে দিতেছি।" এই বলিয়া বাক্স হইতে উইল বাহির করিয়া হেমচন্দ্রের হাতে

দিয়া বলিল, "এই উইল ছিঁড়িয়া ফেল, তা' হইলেই ত বিষয় সম্পত্তি তোমার হইল।"

ভগ্নীর নিঃস্বার্থপরতা দেখিয়া হেমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

হৈমবতী সকলে জলাঞ্জলি দিয়া শেষে কিছু দিন পরে রোগশয্যায় আপনাকেও জলাঞ্জলি দিল।

সম্পূর্ণ।